ইউসুফ আল কারজাভি

মুমিন জীবনে পরিবার

একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবার
গঠনে ইসলামি রূপরেখা

অনুবাদ
মুহাম্মাদ সালেম আল-আযহারী

অনুবাদক পরিচিতি

মুহাম্মাদ সালেম আল-আযহারী।
জন্ম ১ মার্চ, ১৯৮১ সালে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায়। ২০০১ সালে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কামিল হাদিস বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দশম স্থানসহ প্রথম বিভাগে পাশ করেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে মিশর গমন করেন। সেখানে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০৭ সালে হাদিস বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স ও এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে মুহাদ্দিস হিসেবে ইলমে হাদিসের দারস প্রদানের পাশাপাশি আরবি ভাষা কোর্স, বিভিন্ন গবেষণামূলক লেখালেখি, আরবি গ্রন্থাদির অনুবাদ এবং দাওয়াতি কাজে নিয়োজিত।

মুমিন জীবনে পরিবার

(একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবার গঠনে ইসলামি রূপরেখা)

ইউসুফ আল কারজাভি

অনুবাদ : মুহাম্মাদ সালেম আল-আযহারী

প্রকাশকের কথা

ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার সুখী জীবনের অন্যতম মূল ভিত্তি। সত্যি বলতে, পরিবার হচ্ছে অগ্রসর সভ্যতার মূল বিন্দু। বনি আদমকে স্রষ্টার সান্নিধ্যে নিতেই পৃথিবীতে ধর্মের আগমন এবং এর জন্য ধর্মকে অবশ্যই একটি আদর্শ পরিবেশ ও সমাজ কাঠামো তৈরি করতে হয়। ধর্ম ততক্ষণ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ সুশৃঙ্খল পারিবারিক কাঠামো নিশ্চিত করা না যায়।

ধর্ম যখন পারিবারিক ইস্যুতে চোখ বন্ধ করে, তখন পরিবারের সদস্যবৃন্দ ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিধিবিধানের প্রতি বিদ্রোহ করে বসে। কারণটা খুব সিম্পল। বিরাজমান পরিবেশ ও সামাজিক নিয়ম যখন ধর্মের সঙ্গে বিরোধে জড়ায়, তখন স্বভাবতই ধর্ম ও মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। একটা সময়ে এসে ধর্মের প্রভাব মানুষের জীবনে একেবারেই আবেদনহীন হয়ে পড়ে।

প্রাজ্ঞ ও আসমানি ধর্ম হিসেবে ইসলাম তাই পারিবারিক জীবন নিয়ে খুবই সচেতন ও দায়িত্ববান। ইসলাম তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে শক্তিশালী পারিবারিক কাঠামো বিনির্মাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ব্যাপারে ইসলাম খুবই সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তুলে ধরেছে। ব্যক্তি গঠনের শুরুর বিন্দু হিসেবে পরিবারকে সব সময়ই সামনে রেখেছে।

বিশ্বখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত ড. ইউসুফ আল কারজাভি *আল উসরাতু কামা ইউরিদুহাল ইসলাম* নামে পারিবারিক জীবন নিয়ে ইসলামের ফোকাস ও কর্মকৌশল তুলে ধরেছেন। সম্মানিত ভাই মুহাম্মাদ সালেম আল-আযহারী বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। *মুমিন জীবনে পরিবার* নামে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স তা পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছে।

বইটির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ড. ইউসুফ আল কারজাভির গ্রন্থ মানেই বিশেষ কোনো মণি-মুক্তা। আশা করছি, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এই গ্রন্থ থেকে কিছু মণি-মুক্তা সংগ্রহ করতে পারবেন।

একুশ শতকের আজকের দিনে এসে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের ফলে আমাদের মুসলিম সমাজেও যে পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা তৈরি হচ্ছে, তা মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলে বেশ মূল্য দিতে হবে।

আমাদের প্রত্যেকটি পরিবার হয়ে উঠুক জান্নাতে পৌঁছার বাহন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা।
৩১ অক্টোবর, ২০১৯

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক রাহমাতুল্লিল আলামিন সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদ ﷺ এবং অন্যান্য সকল নবি ও রাসূলদের ওপর। অনুরূপভাবে শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বংশধর, সাহাবা একরাম এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল অনুসারীদের ওপর।

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমি এ কথাগুলো লিখেছিলাম দোহায় অনুষ্ঠিত পরিবারবিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে। কাতারের 'সুপ্রিম কাউন্সিল অব ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্স' এই সম্মেলনের আয়োজন করে।

২০০৪ সালের ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর দোহায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে জাতিসংঘ, আরবলীগ, বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবর্গ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

আমার আনন্দের বিষয় ছিল, এ সম্মেলনটি পূর্ববর্তী নারী ও পরিবারবিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রম ছিল। যেমন : ১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মকালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত অধিবাসী সম্মেলন, ১৯৯৫ সালের বেইজিং সম্মেলন এবং নিউইয়র্ক ও বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত অন্যান্য সম্মেলসমূহ। কারণ, এ সকল সম্মেলনগুলোতে আসমানি বিধান পরিপন্থি এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষদের ধর্মবিশ্বাসবিরোধী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। যেমন, পর্নগ্রাফি সমর্থন, সমকামিতা বৈধতা দেওয়া এবং এ যুক্তিতে সকল গর্ভপাতকে বৈধতা দেওয়া যে, নারী তার দেহের ব্যাপারে স্বাধীন; যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, এমনকী গর্ভস্থিত ভ্রূণও হত্যা করতে পারবে! অনুরূপভাবে সন্তানকে যৌন স্বাধীনতা দেওয়া, এ ব্যাপারে পিতা-মাতা কোনো হস্তক্ষেপ না করা; মূলত পিতা-মাতাকে সন্তানের দীক্ষা হতে দূরে রাখা। এতে আরও রয়েছে, পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বিশেষ কোনো দীক্ষা দিতে পারবে না

এবং তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর সন্তানকে গড়ে তুলতে পারবে না! মোটকথা সন্তানদের সম্পূর্ণভাবে পিতা-মাতার শাসনমুক্ত করা, যেন আর কোনো সন্তান এমনভাবে গড়ে না ওঠে। যেমনটি কবি বলেছিলেন :

'আমাদের উঠতি যুবকরা সেসব স্বভাব নিয়েই গড়ে ওঠে,
পিতারা যেসব স্বভাবের ওপর তাদের অভ্যস্ত করে তোলে।'

এসবই ছিল সেসব সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ জন্য বিভিন্ন ঐশী ধর্মের প্রতিনিধিগণ সুষ্ঠ স্বভাব পরিপন্থি, ধর্মবিরোধী এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যুত এ সকল বিষয়ের বিরোধিতা করেছেন। এমনকী আমরা দেখেছি, কায়রোর অধিবাসী সম্মেলনে আল আজহার, ক্যাথলিক চার্চ, অর্থডক্স চার্চ, মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিনিধিগণ সবাই সুষ্ঠু ও বৈধ পরিবার বিধ্বংসী এসব মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এক কাতারে সমবেত হয়েছেন।

অন্যদিকে, দোহারে সম্মেলনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। এর উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা; যার প্রতি সকল ঐশী ধর্মে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে যার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ফলে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্ম যার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

এ পারিবারিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো বিবাহ। এ পবিত্র বন্ধন (যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে) তাদের মাঝে এমন এক প্রকাশ্য ও বৈধ সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করে, যার ফলে পরস্পরের মাঝে অধিকার এবং কর্তব্য আরোপিত হয়।

এ বিবাহের ফসলই হলো সন্তান-সন্ততি। ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন, তারা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে উপহারস্বরূপ। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন–

'তিনি যাকে ইচ্ছা (কন্যা সন্তান) দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা (পুত্র সন্তান) প্রদান করেন।' সূরা শূরা : ৪৯

এ সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, এতে অংশগ্রহণকারী সকলেই অবাধ যৌনতা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে একমত ছিলেন। সকলেই ছিলেন ধর্মীয় ও চারিত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে। এতে অন্যান্য সম্মেলনগুলোর মতো মতবিরোধ দেখা যায়নি। কারণ, এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ আল্লাহ প্রদত্ত

সুষ্ঠু স্বভাবের পথে হেঁটেছেন এবং মানব অস্তিত্বের মৌলিক বিষয় ধর্মের নির্দেশিত পথে ছিলেন। অনুরূপভাবে তারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা মানব সভ্যতার মূল্যবান গুণাবলিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন।

উক্ত সম্মেলনে সকল বক্তব্য, গবেষণা ও আলোচনা উপরোক্ত বিষয়েই কেন্দ্রীভূত ছিল এবং এ উত্তম দৃষ্টিভঙ্গির ওপরই আবর্তিত ছিল। ফলে এর ফলাফলও ছিল উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন–

> ‘যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট, তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়।’ সূরা আরাফ : ৫৮

আমি এ সম্মেলনে দুটো নিবন্ধ পেশ করেছিলাম। একটি ছিল স্থিতিশীল বিবাহ সম্পর্কে। আর অন্যটি ছিল পরিবার গঠনে পিতা-মাতার পারস্পরিক পরিপূরকতা সম্পর্কে।

এ বইয়ে আমি এ দুটো নিবন্ধই প্রকাশ করব।

এখানে সেই কথাটি পুনরায় বলতে চাই, যা আমি ইতঃপূর্বে দোহা সম্মেলনে বলেছিলাম। আর তা হলো– স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিসহ স্বাভাবিক পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণ এবং মৌলিক নীতিমালায় আমরা ঐশী ধর্মাবলম্বীগণ সকলে একমত।

স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি হলো মৌলিক পরিবার অথবা ছোটো বা সংকীর্ণ পরিবার। তবে আমরা প্রশস্ত পরিসরে দীর্ঘ পরিবারের কথাও বলি; যে পরিবারে অন্তর্ভুক্ত থাকে বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা এবং তাদের সন্তানগণ। কুরআনে তাদের ‘উলুল কুরবা’ অথবা ‘জাবিল আরহাম’ অর্থাৎ নিকটাত্মীয় বলা হয়েছে এবং তাদের অধিকারের কথা বর্ণিত আছে। তারা সবাই একটি পরিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত। তাদের জন্য রয়েছে সমন্বিত বিভিন্ন বিধানাবলি। যেমন : উত্তরাধিকার বিধান, ভরণ-পোষণের বিধান এবং ভুলক্রমে ও অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য রক্তপণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের বিধান। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> ‘আল্লাহর কিতাব অনুসারে রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ একে অপরের জন্য অধিকতর ঘনিষ্ঠ।’ সূরা আল-আহজাব : ৬

এমনিভাবে, পরিবারের ব্যাপারে ইসলামে অনেকগুলো বিশেষ বিধান রয়েছে। যেমন : নারীর ওপর পুরুষের কতৃত্ব, উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের অধিকারে পার্থক্য, শর্ত-সাপেক্ষে একাধিক বিয়ের বিধান এবং পারস্পরিক সমঝোতা অসম্ভব হয়ে পড়লে তালাকের বিধান ইত্যাদি। অতএব, মুসলিমদের ওপর এমন কোনো বিধান চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা তাদের ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

আমরা পারস্পরিক ঐক্যমতপূর্ণ বিষয়গুলোতে একে অপরের সহযোগিতা করব এবং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাব- এ সোনালি নীতির আলোকে আমাদের উচিত, প্রত্যেক ধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং বিধানসমূহ সম্মান করা।

> 'হে আমাদের রব, আপনি হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।' সূরা আলে-ইমরান : ৮

ইউসুফ আল-কারজাভি
দোহা, কাতার
শাওয়াল ১৪২৫ হি.
ডিসেম্বর ২০০৪

অনুবাদকের কথা

সামাজিক জীবনের প্রাথমিক বুনিয়াদ হচ্ছে পরিবার। এজন্যই পারিবারিক বিপর্যয়কে সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখতে পাই- জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হলেও বিশ্বব্যাপী পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয়ের ছাপ। নৈতিক মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। ভয়-ভীতি, অশান্তি ও অস্থিরতা বাড়ছে পুরো পৃথিবী জুড়ে। পারিবারিক কলহ, অবাধ যৌনাচার, অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি, কুরুচিপূর্ণ সমকামী ও বহুকামিতার মতো পশুসুলভ যৌন আচরণ সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে। মুসলিম সমাজও আজ আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এ ধরনের নানাবিধ মারাত্মক ব্যধিতে। অথচ ইসলামের শ্বাশত সুন্দর পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালায় মানবজাতির জন্য রয়েছে এক অনন্য শান্ত ও স্থিতিশীল সমাজের গ্যারান্টি।

ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা নিয়ে যুগে যুগে মনীষীগণ বিভিন্ন প্রবন্ধ, গবেষণা ও বই লিখেছেন। বাংলা ভাষায় ও এ বিষয়ে অনেক লিখা প্রতাশিত হয়েছে; তথাপি এ বিষয়ে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম ও গবেষক ডক্টর ইউসুফ আল কারজাভির আরবি ভাষায় লিখিত 'আল উসরাতু কামা ইয়ুরিদুহাল ইসলাম' গ্রন্থটিকে আমার কাছে যুগের চাহিদা অনুযায়ী সাজানো এক অনন্য লেখনী ও গবেষণাকর্ম মনে হয়েছে। কারণ, লেখক এতে একদিকে যেমন পরিবারের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান ও নীতিমালাগুলো আধুনিক গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী চলমান সামাজিক অবক্ষয় ও নানাবিধ বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরে ইসলামের আলোকে তার সুন্দর সমাধানও পেশ করেছেন।

তাই বইটির বিষয়বস্তু ও বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এর প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে আমি এটিকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছি। আরবি ভাষায় লিখিত ডক্টর ইউসুফ কারজাভির অন্যান্য বইগুলোর মতো এ বইটিও উন্নত সাহিত্য, ভাষা শৈলী ও প্রাঞ্জলতায় ভরপুর। অনুবাদের ক্ষেত্রে আরবি ভাষার প্রাঞ্জলতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরে রাখা সম্ভব না হলে লেখকের সাবলীল উপস্থাপনাশৈলী ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে; যদিও ভাষাগত পরিবর্তনের ফলে এ ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে।

আমি আশা করছি, এ বইটি বর্তমান সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাভাষায় অনূদিত এ বইটি প্রকাশের জন্য 'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স'-কে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা বইটির মূল লেখক বর্ষিয়ান আলেম ডক্টর ইউসুফ কারজাভিকে নেক ও সুস্থ হায়াত দান করুন এবং আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ও অন্যান্য নেক কাজগুলো কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মাদ সালেম আল-আযহারী
৪ অক্টোবর, ২০১৯

সূচিপত্র

স্থিতিশীল বিবাহ

পরিবার কী

পরিবার এমন একটি সামাজিক কাঠামো, যা নারী-পুরুষের মধ্যে প্রকাশ্য ও বৈধ বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়। এর ওপর ভিত্তি করে পরস্পরের ওপর অধিকার ও কর্তব্য আরোপিত হয়। এ বন্ধনই হলো বিবাহ। সকল ঐশী ধর্মে এর বিধান রয়েছে। সকল ধর্মেই বিয়েকে বৈধ পরিবার গঠনের একমাত্র মাধ্যম করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কতৃক নির্ধারিত সৃষ্টি জগতে জোড় নীতির যে নিয়ম চলমান রয়েছে, তার সঙ্গে এ বিধানের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। তিনি বলেন–

'আর আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া বানিয়েছি।' সূরা জারিয়াত : ৪৯

সৃষ্টি জগতে এ জোড়া প্রথার অর্থ হলো– প্রত্যেক জিনিসকে তার বিপরীত জোড়ের সঙ্গে মেলানো। যেমন : বিদ্যুতের মধ্যে নেগেটিভ ও পজেটিভের মিলন। অনুরূপভাবে পুংলিঙ্গের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গের মিলন। এ নিয়মেই জগতের গঠন-নীতি চলছে। এ কারণেই প্রোটন ও ইলেকট্রনের পজেটিভ চার্জেরও বিপরীত চার্জ রয়েছে ।

এজন্যই সকল আসমানি কিতাবে নারী-পুরুষের বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এটিই মানুষের সুষ্ঠ স্বভাব ও জগতের চলমান জোড়া নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জগতের সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি। একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোনো কিছুই একক নয়। তিনি বলেন–

> 'পূত-পবিত্র সে সত্তা, যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তা ভূমিজাত উদ্ভিদের মধ্য থেকে হোক অথবা স্বয়ং এদের নিজেদের প্রজাতির অর্থাৎ মানব জাতির মধ্য থেকে হোক কিংবা এমন জিনিসের মধ্য থেকে হোক, যাদের এরা জানেও না।' সূরা ইয়াসিন : ৩৬

একইভাবে তাওরাতের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়–

> 'পুরুষ তার পিতা-মাতা হতে আলাদা হয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়। এভাবে দুজনে এক দেহে পরিণত হয়।'

ঈসা (আ.) তাঁর শিষ্যদের এ ব্যাপারে বলেছিলেন।[১]

স্থিতিশীল বিবাহ

সেই পরিবারকে উত্তম পরিবার বলে, যা স্থিতিশীল বিবাহ বন্ধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক মায়া-মমতা ও ভালোবাসা। এটি পবিত্র জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনের স্থিতিশীলতার জন্য এটি একটি মৌলিক উপাদান।

ইসলাম এ জন্যই বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পাশাপাশি এটি প্রতিষ্ঠিত করা, এর সুফল অব্যাহত রাখা এবং একে ছিন্নতা ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য মানসিক, চারিত্রিক ও আইনগত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

এ ক্ষেত্রে ইসলাম প্রথম যে কাজটি করেছে তা হলো- বিবাহের মূল হাকিকত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুসলিমদের সচেতন করেছে। যেন মুসলিমরা মূল বাস্তবতা জেনে ও বুঝে অগ্রসর হতে পারে এবং ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কারণ, ভ্রান্ত ধারণার কারণেই মানুষ বিভ্রান্তিমূলক আচরণ করে।

বিবাহের ইচ্ছুক প্রত্যেক মুসলিমের জেনে রাখা উচিত, বিবাহ নিছক কোনো শারীরিক বন্ধন নয়। বিবাহের অন্তর্গত অর্থ হলো একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের বন্ধন। এ বন্ধন বলতে মন-মনন, অস্থিমজ্জার বন্ধনকে বোঝায়,

---

[১]. ইঞ্জিল মথি : ৪-৬/১৯, ইঞ্জিল গসপেল : ৬-৯/১০

যা শারীরিক সম্পর্কের চেয়েও বেশি কিছু। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বুদ্ধি, বিবেক, আবেগ-অনুভূতি ও রুহ।

এর অর্থ এটা নয় যে, দৈহিক সম্ভোগ ও প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো ইসলামসম্মত বিবাহের উদ্দেশ্য বহির্ভূত বিষয়; বরং স্বভাবগতভাবে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক যৌন চাহিদা মেটানো এবং পবিত্র ও হালাল উপায়ে পরস্পরের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করা বিবাহের একটি অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন–

> 'তারা তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের পোশাকস্বরূপ।' সূরা আল বাকারা : ১৮৭

উদ্দেশ্য হলো, যেন মুমিন বান্দা তার প্রবৃত্তির চাহিদাকে হালালমুখী করে এবং নিজেকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশিক্ষণ নিতে পারে। আর এর দ্বারা প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হবে এবং মনের চাহিদা সংযত হবে। এ জন্যই নবি ﷺ যুবকদের সম্বোধন করে বলেছেন–

> 'ওহে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য (সক্ষমতা ও ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য) রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কারণ, তা (হারাম হতে) দৃষ্টিকে অধিক অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে অধিক রক্ষাকারী।' বুখারি : ৫০৬৫, মুসলিম : ১৪০০

কিন্তু একজন মুসলিমের বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরও বেশ কিছু উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকে। আর তা হলো– ঈমানের সহিত পরিপূর্ণ ঘর বাঁধা এবং উত্তম পরিবার গঠন করা। যেন তাদের দ্বারা উত্তম সমাজ বিনির্মাণের ভিত রচিত হতে পারে। ঈমানের সহিত গড়ে উঠা ঘর তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যথা : প্রশান্তি, ভালোবাসা ও দয়া। কুরআনে এ তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করে এগুলোকে আল্লাহর নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঈমানদারের বৈবাহিক জীবন এ তিনটি বিষয়ের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।' সূরা রুম : ২১

বিবাহের মাধ্যমে কেবল একজন নারী ও পুরুষের মাঝেই সম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টি হয় না; বরং দুটো পরিবারের মাঝেও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কুরআনুল কারিমে উক্ত সম্পর্ককে রক্ত সম্পর্কের সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে। তারপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন।' সূরা ফুরকান : ৫৪

একটু বাড়িয়ে বলতে গেলে কুরআনের দৃষ্টিতে বিবাহ এমন একটি বিষয়, যা পৃথিবী সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অবদান রাখে। বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এটিও বিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।' সূরা আন-নাহল : ৭২

অন্যদিকে, মানুষ স্বভাবগতভাবে স্থায়িত্ব পছন্দ করে। ফলে সে সন্তান লাভে আগ্রহী হয়। যেন মৃত্যুর পরও তার নিদর্শন বাকি থাকে। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, নবি আলাইহিমুস সালামগণ আল্লাহর কাছে সন্তান চেয়েছেন। যেমন : ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন–

> 'হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন। (আল্লাহ বলেন) অতঃপর তাকে আমি পরম ধৈর্যশীল একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।' সূরা আস-সাফফাত : ১০০-১০১

আমরা দেখেছি, জাকারিয়া (আ.) বলছেন–

> 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা রেখ না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিশ। (আল্লাহ তায়ালা বলেন) অতঃপর আমি তাঁর দুআ কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম।' সূরা আল-আম্বিয়া : ৮৯-৯০

বিবাহের এ সকল মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার পর মুসলিমদের উচিত সে সকল মৌলিক নীতিমালা ও উপাদান সম্পর্কে জানা, যার ওপর ভিত্তি করে উত্তম বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে। এখন এ ব্যাপারে পরের অধ্যায়গুলোতে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

উত্তম সঙ্গী নির্বাচন

বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করার পর প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উচিত সঠিকভাবে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা। কারণ, এটি সুখী দাম্পত্য জীবন ও স্থিতিশীল পরিবার গঠনের জন্য সর্বপ্রথম পদক্ষেপ।

এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো– নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি নির্ধারণ করা। বস্তুগত মাপকাঠি যেন এ ব্যাপারে মূল ভিত্তি বা মৌলিক কেন্দ্রবিন্দু না হয়। কাজেই, সম্পদের ওপর ভিত্তি করে যেন কাউকে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করা না হয়। অনুরূপভাবে কেবল নারীর দৈহিক সৌন্দর্য যেন পছন্দ করার প্রধান কারণ না হয়। এ ক্ষেত্রে মৌলিক কতগুলো বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। যেমন–

১. উত্তম চরিত্র ও ধার্মিকতা

সৎ হওয়া। অর্থাৎ ধর্ম ও চরিত্রের দিক থেকে সৎ হওয়া। যে ব্যক্তি ধার্মিক নয় এবং চরিত্রের দিক থেকেও সন্তোষজনক অবস্থানে নেই, তার তো ব্যবসায়িক অংশীদার হওয়ারই যোগ্যতা নেই। তাহলে সে কীভাবে পূর্ণ জীবনের অংশীদার হবে!

এ জন্য নবি ﷺ বলেছেন–

> 'পৃথিবী এক উপভোগ্য সামগ্রী। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী হচ্ছে পুণ্যময়ী নারী।' মুসলিম : ১৪৬৭

তিনি আরও ইরশাদ করেন–

> '(সাধারণত) নারীদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করো : তার ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারি। তুমি দ্বীনদার নারীকে বিবাহ করে ধন্য হও।' বুখারি : ৫০৯০, মুসলিম : ১৪৬৬

তিনি আরও বলেন–

> 'যাকে আল্লাহ তায়ালা পুণ্যময়ী স্ত্রী দান করেছেন, তার অর্ধেক দ্বীন পূরণে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন। অতএব, বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে চলে।' তাবরানি

ওই নারীই ধার্মিক নারী, যে স্বামীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয় অবস্থায় তার অধিকার সংরক্ষণে আল্লাহকে ভয় করে চলে। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

> 'তাই নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত। আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন, স্বামীর অনুপস্থিতে তা তারা হেফাজত করে।' সূরা নিসা : ৩৪

হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় কেবল সম্পদের জন্য নারীদের বিয়ে করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, সে হয়তো সম্পদের কারণেই অবাধ্য হয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে কেবল সৌন্দর্যের জন্যও বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এই সৌন্দর্যই হয়তো তার ঈমান নষ্টের কারণ হবে; বিশেষ করে যদি পারিবারিক দীক্ষা খারাপ হয়ে থাকে। এমন নারীকে আবর্জনাময় স্থানে উৎপন্ন সবুজ উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

অন্যদিকে স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে হাদিসে নারী ও তার অভিভাবকদের লক্ষ করে বলা হয়েছে–

> 'যদি তোমাদের নিকট এমন কোনো ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার চরিত্র ও ধার্মিকতা তোমাদের কাছে সন্তোষজনক, তবে তার নিকট বিবাহ দাও। যদি তোমরা এমনটি না করো, তবে ভূপৃষ্ঠে ব্যাপক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।' তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকি।

সালফে সালেহিনদের মাঝে কেউ কেউ বলতেন–

> 'তোমার মেয়েকে বিবাহ দিতে চাইলে দ্বীনদার পাত্র দেখে বিবাহ দাও। কারণ, সে যদি তাকে ভালোবাসে, তবে তাকে সম্মান করবে। আর যদি তাকে অপছন্দ করে, তবে অন্তত তার প্রতি জুলুম করবে না।'

আবার কেউ কেউ বলেছেন–

> 'যে ব্যক্তি তার মেয়েকে কোনো ফাসিকের সঙ্গে বিবাহ দিলো, সে যেন তার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করল।'

এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, যুগশ্রেষ্ঠ তাবেয়ি সাইদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) তাঁর মেয়েকে উমাইয়া খলিফার ছেলে, ভবিষ্যৎ খলিফার নিকট বিবাহ দিতে অস্বীকৃতি জানান। এর পরিবর্তে তিনি মেয়েকে এক দরিদ্র ছাত্রের নিকট বিবাহ দেন। কারণ, তিনি খলিফা পুত্রের চেয়ে সেই গরিব ছাত্রের মাঝে অধিক পরহেজগারিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তাকেই নিজের মেয়ের জন্য অধিকতর নিরাপদ আশ্রয় মনে করেছেন।

মূলত বিবাহ হলো একজন মানুষের সঙ্গে অপর একজন মানুষের সম্পর্কের বন্ধন। আর মানুষ বলতে তার সম্পদ, শান-শওকত, চেহারা বা দৈহিক আবরণকে বোঝানো হয়নি; বরং বুদ্ধি, বিবেক ও প্রাণই হলো মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। কাজেই, বিবাহের ক্ষেত্রে এসবই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ, এসবই টিকে থাকে, আর অন্য সব বাহ্যিক বস্তু সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী।

২. মনের মিল

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– পরস্পরের মাঝে মনের মিল। কোনো কোনো মানুষ এমন আছে, যার সাথে কখনো একসঙ্গে থাকতে পারবেন না। হয়তো বাহ্যিকভাবে তার মাঝে তেমন কোনো দোষ নেই। তবে তার মানসিকতার সাথে আপনার মানসিকতা মিলছে না। এ ব্যাপারে হাদিসে বলা হয়েছে–

> 'মানবাত্মাসমূহ যেন বিভিন্ন সমষ্টিতে বিভক্ত। (আদিতে) যারা পরস্পর পরিচিত হয়েছে, এখানেও (দুনিয়ায়) তারা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আর সেখানে যারা পরস্পর অপরিচিত ছিল, এখানে তাদের মধ্যে অনৈক্য হবে।' বুখারি : ৩৩৩৬

অতএব, আত্মাসমূহের মাঝে মিল থাকলে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। আর অমিল থাকলে অনৈক্য দেখা দেবে।

এ বিষয়টি কখনো কখনো প্রথম দৃষ্টিতেই অথবা প্রথম সাক্ষাতেই উপলব্ধি করা যায়। আবার কখনো-বা ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার পর অথবা ছোটোখাটো আচরণের মাধ্যমে বোঝা যায়। তখন হয়তো দেখা যায়, তার প্রতি কোনো মহব্বত সৃষ্টি হচ্ছে না; বরং দুজনের আন্তরিক সম্পর্কের মাঝে যেন দেখা দিয়েছে অভেদ্য দেয়াল।

হয়তো এ কারণেই নবি ﷺ বিবাহের জন্য প্রস্তাবকৃত নারীকে আগেই দেখে নিতে বলেছেন। একজন সাহাবি যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জানালেন, তিনি এক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি তাকে দেখেছ?'

জবাবে তিনি বললেন, 'না!'

তখন আল্লাহর রাসূল বললেন–

> 'তাকে দেখে নাও। কারণ, এটি তোমাদের মাঝে সম্পর্ক স্থায়ী হওয়ার উত্তম পদ্ধতি।' মুসনাদে আহমাদ : ১৮১৫৪

অর্থাৎ পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়ের ফলে একে অপরের প্রতি হয়তো টান অনুভূত হবে। কারণ, চোখ হলো অন্তরের দূত। দেখার অধিকার কেবল পুরুষের জন্য নয়; বরং নারীরও অধিকার। এ জন্য পুরুষ যেমনিভাবে তার হবু স্ত্রীকে ﷺ দেখবে, তেমনি নারীর জন্যও হবু স্বামীকে দেখার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একে অপরের সঙ্গে কথা বলবে, যেন কথাবার্তা ও আচার-আচরণে একে অপরকে বুঝতে পারে। সেইসঙ্গে চেহারা-সুরতের দিক থেকেও যেন একে অপরের মনপূত হয়।

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এর মাধ্যমে যেন একে অপরের অন্তরে জায়গা করে নিতে পারে। যেন পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ, পরিপূরক ও নিজের অংশবিশেষ মনে হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'তোমরা একে অপরের অংশ।' সূরা আলে ইমরান : ১৯৫

এমন যেন মনে না হয় যে, তাদের দুজন দুই মেরুতে। একজন প্রাচ্যে আরেকজন পাশ্চাত্যে। এমন হলে দুজনের মাঝে কোনো মিল থাকবে না।

পারস্পরিক মনের এই টান-ই হলো 'মনের মিল', যা নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছি। এর অর্থ, দুজনের মাঝে এমন মিল থাকবে, যেন দুজন একই ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে আরবি ভাষা তথা কুরআনের ভাষার অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হলো, দুজন জীবনসঙ্গী প্রত্যেককেই এখানে (زوج) বা জোড় বলা হয়েছে। আর জোড় মানে একই রকম। প্রত্যেকের মাঝেই যেন অপরজন নিহিত রয়েছে। দুজন যেন একাকার হয়ে গেছে।

এখানে আরেকটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। তা হলো, ইসলাম বাগদত্তা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য দেখার যে বিধান রেখেছে, তা আজ অবধি কোনো কোনো মুসলিম দেশে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত। বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশসমূহে। দেখা যাচ্ছে– প্রস্তাব প্রদানকারী হবু স্বামীকে কোনো অবস্থাতেই তার বাগদত্তা স্ত্রীকে দেখতে দেওয়া হয় না। তারা পূর্বপুরুষদের মূর্খ নীতি অনুসরণ করে ইসলামি বিধানকে দোষের বিষয় মনে করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে, কোনো যুবক তার বাগদত্তা স্ত্রীকে অথবা কোনো যুবতী তার বাগদত্তা স্বামীকে বাসর রাতের আগে দেখা অন্যায়। এমনকী তাদের অনেকে আকদের পরও এমনটি মনে করে!

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো– এ বাগদত্তা নারী স্কুল, ভার্সিটি, মার্কেট অথবা হাসপাতালে আসা-যাওয়া করছে, এমনকী বিভিন্ন আরব দেশ বা ইউরোপিয়ান দেশেও ভ্রমণ করছে। জীবনে অনেক পুরুষকে দেখছে এবং তারাও তাকে দেখছে। যেমন : মার্কেটে বিক্রেতাকে দেখছে, হাসপাতালে ডাক্তারকে দেখছে, ভার্সিটিতে শিক্ষককে দেখছে, বিমানে এয়ার হোস্টকে দেখেছে এবং এভাবে আরও অনেককে দেখছে, অথচ একমাত্র যে বেচারা তাকে দেখতে পারবে না, সে হলো তার হবু বর!

৩. পারস্পরিক উপযুক্ততা

তৃতীয় বিষয় হলো– অর্থ, মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, বয়স ও সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে নিজের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী খুঁজে নেওয়া। যাতে এগুলোর কোনোটির অনুপস্থিতি বৈবাহিক জীবনে অস্থিরতা বা বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। অতএব, দরিদ্র ব্যক্তির জন্য এমন ধনী নারী খোঁজা উচিত নয়, (যার ব্যয়ভার সে বহন করতে পারবে না। উলটো) স্ত্রীর সম্পদে তাকে চলতে হয়। কারণ, মূলনীতি হলো– পুরুষ হবে নারীর ওপর কর্তৃত্বশীল, সে নারীর ব্যয়ভার বহন করবে। এখন স্ত্রী যদি তার ব্যয়ভার বহন করে, তবে পুরুষ আর স্ত্রীর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল হতে পারবে না।

অনুরূপভাবে মূর্খ বা অর্ধ-মূর্খ পুরুষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষিত নারী বিবাহ করা উচিত নয়। অন্যদিকে এর বিপরীতে মূর্খ নারীর জন্যও উচ্চ শিক্ষিত পুরুষকে বিবাহ করা উচিত নয়। কারণ, দুজনের মাঝে জ্ঞানের বিস্তর তফাত থাকে। ফলে দেখা যাবে, তারা কেবল খাবার-দাবার ও যৌন সম্ভোগেই একে অপরের অংশীদার হবে; অন্য কিছুতে নয়।

এমনিভাবে, যুবকের উচিত নয় বৃদ্ধা নারীকে বিবাহ করা এবং যুবতী নারীরও উচিত নয় বৃদ্ধ পুরুষকে বিবাহ করা। কারণ, এ সকল ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় আর্থিক কারণে বিবাহ ঘটে! এতে বিবাহের মৌলিক উদ্দেশ্য নষ্ট হয় এবং নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

এ জন্যই আনসারি যুবক সাহাবি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﵁ যখন নবি ﷺ -কে নিজের বিবাহের সংবাদ দিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'সে কি কুমারী, না বিবাহিতা?' তিনি বললেন, 'বিবাহিতা'। তখন নবি ﷺ বললেন– 'কুমারী বিবাহ করলে না কেন, তাহলে একে অপরের সঙ্গে খেলাধুলা ও হাসি-রসিকতা করতে পারতে?' আল লু'লু' ওয়াল মারজান : ৯৩০

তখন জাবির ﵁ জানালেন, তার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন এবং তাঁর অনেকগুলো ছোটো বোন রয়েছে। তাদের লালন-পালনের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নারীর প্রয়োজন (কারণ, তাদের মা ছিল না)। এজন্য যদি তাদের বয়সি কুমারী মেয়ে বিবাহ করেন, তবে হয়তো তাদের সুষ্ঠু লালন-পালন সম্ভব হবে না।

তাই তিনি ছোটো বোনদের দিকে লক্ষ করে কুমারী নারী বিবাহ না করে বিবাহিত নারী বিবাহ করেছেন; যেন তাদের মায়ের মতো লালন-পালন করতে পারে।

এতে আমরা বুঝতে পারি, কখনো কখনো বাহ্যিক উপযুক্ততাকে তার চেয়ে বড়ো কোনো কারণে উপেক্ষা করা হয়। তাই কখনো দেখা যায়, কোনো পুরুষ তার চেয়ে বয়সে বড়ো নারীকে বিবাহ করে। আবার কোনো কোনো নারী তার চেয়ে বয়সে ছোটো পুরুষকে বিবাহ করে এমন শক্তিশালী কারণে, যাতে উভয়েই আন্তরিকভাবে পরিতুষ্ট থাকে। ফলে তাদের বৈবাহিক জীবনেও মজবুত ভিত্তি এবং স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

পছন্দের স্বাধীনতা

উত্তম সঙ্গী নির্বাচনের সাথে সাথে এখানে আরেকটি বিষয় আবশ্যক। তা হলো– নারী-পুরুষ উভয়েই স্বাধীনভাবে সঙ্গী নির্বাচন করবে। অন্য কেউ তাদের ওপর সঙ্গী পছন্দ করার বিষয়টি চাপিয়ে দেবে না; এমনকী প্রিয় বাবা, মমতাময়ী মাতা বা আপন ভাইও না।

যে বিয়ে কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ, আর্থিক কিংবা অন্য কোনো বাধ্য-বাধকতা ছাড়া স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হয়, তাকেই স্থিতিশীল ও সুষ্ঠু বিবাহ বলে। এটি পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

আমাদের সমাজে এখনও কিছু পুরাতন রীতি চালু রয়েছে। এর ফলে সন্তানদের বৈবাহিক জীবনের ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা হয়। চাই সে ছেলে হোক কিংবা মেয়ে। যদিও মেয়েদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের মাত্রাটা একটু বেশি ও শক্তিশালী।

অনেক সময় প্রজন্মের ভিন্নতার ফলে পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে ছেলেমেয়েদের চিন্তার ভিন্নতা বা বৈপরিত্য দেখা দেয়। আবার কোনো কোনো পরিবারে এমন কিছু রীতি-নীতি চালু রয়েছে, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলিল বা প্রমাণ নেই।

যেমন, ছেলের বিবাহের জন্য চাচাতো বোন নির্ধারিত থাকা এবং তাকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া জায়েজ মনে না করা। অনেক সময় দেখা যায়, উক্ত ছেলে তার চাচাতো বোনকে বিবাহ করতে আগ্রহী নয় এবং সেই বোনও তাকে বিবাহ করতে অনাগ্রহী। হয়তো তাদের অন্তর অন্য কারও সঙ্গে যুক্ত এবং তারা প্রত্যেকে একে অপরের সম্পর্কের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত। এরপরও পরিবারের কর্তা-ব্যক্তিরা ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে তাদের ওপরে নিজস্ব রীতি চাপিয়ে দেয়। তখন হয়তো তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু সেই বিয়ে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। ফলে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

মিশরের উষ্ণ অঞ্চলে কিছু গোত্র রয়েছে, তারা মেয়েদের চাচাতো ভাই না হলেও স্বীয় গোত্রের বাহিরে বিবাহ দেয় না। গোত্রের বাহিরের মিশরিদের তারা কৃষক বলে অভিহিত করে। তারা মনে করে, ওরা তাদের মেয়ের জন্য উপযুক্ত নয়। এমনকী গোত্রের বাহিরের কোনো লোক যদি জ্ঞান ও সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে উচ্চ অবস্থানেও পৌঁছে, তারপরও সে ওই সকল গোত্রের কাছে কৃষকই রয়ে যায়। তাদের মাঝে এ প্রবাদ চালু রয়েছে যে, 'মেয়েকে কুমিরে খেয়ে ফেলুক, তবুও কৃষক যেন না নেয়।'

কখনো দেখা যায়, যাকে তারা কৃষক বলে প্রত্যাখ্যান করছে, সে হয়তো উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক।

কখনো দেখা যায়– কোনো ব্যক্তির আর্থিক বা সামাজিক অবস্থানের কারণে পরিবার তার কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে চায়, কিন্তু মেয়ে তাকে বিবাহ করতে চায় না। এমনকী মেনেও নিতে পারে না। কিন্তু পারিবারিকভাবে জোর করে এ তিক্ত বিবাহ গলদকরণ করানো হয় এবং যাকে চায়, তাকে বিয়ে করতে বাধা প্রদান করা হয়। অথচ এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন–

> 'যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য বিয়ের মতো উত্তম আর কিছু নেই।' ইবনে মাজাহ : ১৮৪৭

ছেলেদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। কখনো দেখা যায়, পরিবার তার আবেগ-অনুভূতিকে গুরুত্ব না দিয়ে কোনো সম্ভ্রান্ত বা ধনী পরিবারে বিয়ে দেয়। এ ধরনের বৈষয়িক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যে বিবাহ সংঘটিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

জাহেলি যুগে আরব সমাজে এ ধরনের জবরদস্তিমূলক বিবাহের প্রচলন ছিল। ইসলাম এসে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে চাপমুক্ত করেছে এবং স্বাধীনতা প্রদান করেছে। যেন সে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে পারে এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে।

এ জন্যই রাসূল ﷺ সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়ে, বিশেষ করে নারীদের স্বামী নির্বাচনে স্বাধীনতা দিয়ে উম্মাহর প্রতি সুবিচার করেছেন। নারী যখন কোনো পাত্রকে অপছন্দ করে এবং বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে জোর করে বিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন।

এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ আনসারি নারী খানসা বিনতে খুদ্দামের বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

> যখন খানসা বিনতে খুদ্দাম অভিযোগ করেছিলেন, তার বাবা তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ দিয়েছে! তিনি ছিলেন 'সাইয়্যেবা' অর্থাৎ পূর্বে তার একবার বিবাহ হয়েছিল। বুখারি, মুসনাদে আহমাদ

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে–

> 'একজন কুমারী মেয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে জানাল যে, তার বাবা তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বিবাহ দিয়েছে! তখন তিনি সেই মেয়েকে বিবাহ রাখা না রাখার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।' আবু দাউদ : ২০৯৬, ইবনে মাজাহ : ১৮৭৫

আল্লামা সানআনি তাঁর *সবুলুস সালাম* গ্রন্থে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, ইতঃপূর্বে আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে– 'কুমারী নারীকে তার অনুমতি ব্যতিত বিবাহ দেওয়া যাবে না।' এই হাদিসের অর্থ সুস্পষ্ট। এতে প্রমাণিত হয়, মেয়েকে জোর করে বিবাহ দেওয়া ইসলামে হারাম। অতএব, অন্য অভিভাবকগণের ক্ষেত্রে এ হুকুম আরও ভালোভাবে সাব্যস্ত হবে।

যারা বলেন, হাদিসে বর্ণিত উক্ত মেয়েকে তার পিতা অনুপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল বলে এমন স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে! তাদের প্রত্যুত্তরে আল্লামা সানআনি বলেন, এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

কারণ, এমন কিছু হলে মেয়েটি তা উল্লেখ করত; বরং সে বলেছে, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিতা তাকে বিবাহ দিয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, অপছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার কারণেই তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এখানে এ কারণটিই উল্লেখ করা হয়েছে, অতএব তাকে বলা হয়েছে- তোমার যখন অপছন্দ, তাহলে এ ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা রয়েছে।

'উম্মুল মোমেনিন আয়েশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি মেয়ে তাঁর কাছে এসে বলল– "আমার পিতা নিজের মর্যাদা উঁচু করার জন্য আমাকে তার ভাতিজার কাছে বিবাহ দিয়েছে, অথচ আমি তাকে পছন্দ করি না।" তিনি বললেন, নবি ﷺ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। অতঃপর নবি ﷺ আসার পর তিনি তাকে এ ব্যাপারে জানালেন। রাসূল ﷺ তার পিতাকে ডেকে আনলেন এবং মেয়েকে এ বিয়ে রাখা বা না রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করলেন। তখন মেয়েটি বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা যা করেছে, তাতে এখন আমি রাজি হয়েছি। কিন্তু আমি নারী সমাজকে এটি জানিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম যে, তাদের পিতা তাদের ওপর জোর করতে পারবে না।"' সুনানে নাসায়ি

অর্থাৎ, মেয়েদের অপছন্দনীয় পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অভিভাবকগণ জোর করতে পারবে না। হাদিসের বর্ণনা দ্বারা এটাই বোঝা যাচ্ছে।

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে– 'কুমারী মেয়ের থেকে তার পিতা (বিয়ের ব্যাপারে) অনুমতি নেবে।' মুসলিম : ১৪১৯

নাসায়ি ও অন্যদের বর্ণনায় এ হাদিস এসেছে–

'ইয়াতিম মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তার অনুমতি নেওয়া হবে। আর যদি সে চুপ থাকে, তবে তা অনুমতি হিসেবে গৃহীত হবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না।' হাদিস : ৩২৭০

অতএব বোঝা গেল, নারী তার নিজের ব্যাপারে কর্তৃত্বশীল। সে নিজেই তার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করবে। অভিভাবক যদি তা নির্বাচন করে, তবে সে ব্যাপারে তার অনুমোদন নিতে হবে। অন্যথা বিবাহ কার্যকর হবে না।

তবে কোনো কোনো মাজহাবে বিয়েতে অভিভাবকের উপস্থিতির যে শর্ত রাখা হয়েছে, বিবাহ যেন সকল পক্ষের সন্তুষ্টিতে সংঘটিত হয় সে জন্য। পরবর্তী সময়ে যেন ঝামেলা না হয়। এমনকী নিজের মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য বলা হয়েছে। কারণ, বাবার চেয়ে মা তার মেয়ের ব্যাপারে অধিক বেশি অবগত থাকেন। অন্যদিকে এর উদ্দেশ্য হলো, নিজের অপছন্দে বিবাহ হওয়ার কারণে মা যেন পরবর্তী সময়ে তার মেয়ের দাম্পত্য জীবনে সমস্যা সৃষ্টি না করে।

সঙ্গীর অধিকার আদায়

পারিবারিক সম্প্রীতি সৃষ্টিকারী স্থিতিশীল বিবাহের তৃতীয় ভিত্তি হলো– স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে পারস্পরিক অধিকার আদায়ে যত্নশীল হওয়া। এ ব্যাপারে ত্রুটি না করা এবং অপরের প্রতি জুলুম না করা।

প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকারের সাথে সাথে তার ওপর করণীয় কর্তব্যও রয়েছে। অতএব, কেউ তার নিজের কর্তব্য পালন না করে অপরের ওপর নিজের অধিকার দাবি করতে পারবে না। বরং ইসলামের মূলনীতি হলো, কেউ তার কর্তব্য আদায় করার পরই তাকে অধিকার প্রদান করা হবে। যেমন : সন্তানের ওপর পিতার অধিকার হলো, সদ্ব্যবহার পাওয়া। অন্যদিকে পিতার ওপর সন্তানের অধিকার হলো সুন্দর প্রতিপালন এবং উত্তম দীক্ষা লাভ করা। স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার হলো, ভরণ-পোষণ লাভ করা এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার হলো, পরিবারের ওপর তার কর্তৃত্বকে সম্মান জানানো।

যখন কেউ আল্লাহর নির্দেশিত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করবে, বিনিময়ে সে তার প্রাপ্য অধিকার লাভ করবে।

এ জন্য ইসলাম অধিকারের দাবির চেয়ে কর্তব্য আদায়ের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করেছে।

মূলনীতি হলো– স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের অধিকার আদায় করবে এবং পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালন করবে। এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

> 'নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমনি আছে তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের ওপর মর্যাদা।' সূরা বাকারা : ২২৮

এখানে 'মর্যাদা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– পুরুষকে যে কর্তৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে কর্তৃত্বের মর্যাদা। এর ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে, এটি হলো পরিবারের ওপর কর্তৃত্বশীল পুরুষের দায়িত্ব; যা নারীর চেয়ে বেশি।

বায়হাকির একটি বর্ণনায় আছে–

> 'উম্মতের প্রখ্যাত আলেম, কুরআনের মুখপাত্র ইবনে আব্বাস ﵁ একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল-দাঁড়ি আঁচড়িয়ে চেহারা পরিপাটি করছিলেন। তা দেখে নাফে (র.) বললেন, "হে রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই! আপনি এ কী করছেন! অথচ আপনার কাছে মানুষ দূর-দূরান্ত হতে ইলম শিখতে আসে!" তখন তিনি বললেন, "এতে কী এমন হয়েছে হে নাফে? আমি আমার স্ত্রীর জন্য পারিপাটি হই, যেমনিভাবে সে আমার জন্য সাজগোজ করে। আমি আল্লাহর কিতাবে এ ব্যাপারে নির্দেশনা পেয়েছি।" তখন নাফে বললেন, "এটি আল্লাহর কিতাবের কোথায় পেয়েছেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহর এ কথার মাঝে, নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমনি আছে তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার।"' সূরা বাকারা : ২২৮

অতএব, যেমনিভাবে স্ত্রীর দায়িত্ব হলো তার স্বামীর জন্য সাজগোজ করা, তেমনিভাবে তার অধিকার হলো স্বামী তার জন্য পরিপাটি হবে। এটাই ন্যায়সংগত।

শরয়ি বিধান এবং ন্যায়সংগত প্রথা অনুসরণ

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রথম কর্তব্য হলো সমস্ত ন্যায়সংগত অধিকার সম্পর্কে জানা। তা দুটি উপায়ে জানা যেতে পারে।

এক. শরয়ি বিধান, দুই. ন্যায়সংগত প্রথা। কেননা, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পরিবার দুটি মূলভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা : আল্লাহর বিধান ও ন্যায়সংগত নিয়ম।

১. আল্লাহর বিধান

এখানে আল্লাহর বিধান বলতে বোঝানো হচ্ছে, তাঁর সে সকল হুকুম-আহকাম ও আদেশ-নিষেধ, যাতে পারিবারিক ব্যবস্থার নিয়মকানুন ও বিধিবিধান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য কুরআনে পারিবারিক বিষয়ে বারবার বলা হয়েছে–

> 'এসব আল্লাহর সীমারেখা। অতএব, তোমরা এ সীমা লজ্ঘন করো না, আর যারা আল্লাহর সীমারেখা লজ্ঘন করে, তারাই অত্যাচারী।' সূরা বাকারা : ২২৯

অন্যত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন–

> 'এসব আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহর সীমারেখা লজ্ঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে।' সূরা তালাক : ১

স্বামীর ওপর স্ত্রীর যে সকল অধিকারের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

মোহর : এটি নারীর অধিকার। পুরুষ তার আন্তরিক ভালোবাসা ও আগ্রহের নিদর্শন হিসেবে এবং নারীর ভালোবাসা অর্জনের জন্য হাদিয়াস্বরূপ এটি প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর তোমরা স্ত্রীদের খুশি মনে মোহর দিয়ে দাও। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।' সূরা নিসা : ৪

ভরণ-পোষণ : পুরুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী অপচয় কিংবা কৃপণতা ব্যতীত নারীর জন্য উপযুক্ত খাবার-পানীয়, পোশাক, সাজ-সজ্জা, বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। প্রত্যেকে তার অবস্থা অনুযায়ী এটি করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিজিকপ্রাপ্ত, তাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে।' সূরা তালাক : ৭

রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীর জন্য ব্যয় করাকে জিহাদের জন্য দান করা এবং মিসকিনদের সাদাকা করার চেয়ে উত্তম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম : ১৮২৭

স্ত্রীর সাথে সৎভাবে জীবনযাপন : আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'তোমরা নারীদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো।' সূরা নিসা : ১৯

এর অর্থ হলো– তার সাথে কথা ও কাজে সুন্দর ও কোমল আচরণ করা এবং কঠোরতা ও রূঢ় আচরণ না করা। আল্লাহ তায়ালা তাদের অধিকারের গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেন–

'নারীরা তোমাদের কাছে থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।' সূরা নিসা : ২১

নবিদের ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালা এমন কথা বলেছেন–

'যখন আমি নবিদের থেকে অঙ্গিকার নিয়েছিলাম এবং আপনার থেকেও এবং নুহ, ইবরাহিম, মুসা ও ঈসা ইবনে মরিয়মের থেকেও; আমি তাদের থেকে নিয়েছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার।' সূরা আহজাব : ৭

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা দশটি অধিকারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন–

'আর তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করো এবং কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম-মিসকিন, আত্মীয়-প্রতিবেশী, সঙ্গী ও নিজের দাস-দাসীর সাথেও (সদ্ব্যবহার করো)। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক-গর্বিতদের পছন্দ করেন না।' সূরা নিসা : ৩৬

এ আয়াতে 'সঙ্গীর ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা নিজ স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

বিদায় হজের ভাষণে নবি ﷺ নারীদের ব্যাপারে ওসিয়ত করে বলেন–

> 'তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।' মুসলিম : ১২১৮

তিনি আরও বলেন–

> 'আমি তোমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ করো।' বুখারি : ৫১৮৬, মুসলিম : ১৪৬৮

অতএব, পুরুষের কর্তব্য হলো স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা, তার খারাপ আচরণে ধৈর্য ধারণ করা। সেইসঙ্গে স্ত্রীর মধ্যে অপছন্দনীয় কোনো কিছু লক্ষ করলে, সে কারণে তাকে ত্যাগ করার দ্রুত সিদ্ধান্ত না নেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্‌ভাবে জীবনযাপন করো। যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।' সূরা নিসা : ১৯

স্ত্রীর সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে পুরুষকে বাস্তববাদী হওয়া উচিত। নিখুঁত স্ত্রীর কল্পনা-বিলাসী হওয়া উচিত নয়। মানবিক বাস্তবতার আলোকে স্ত্রীর সাথে আচরণ করা উচিত। তার নেতিবাচক দিকগুলোর সাথে সাথে ইতিবাচক গুণগুলোও দেখতে হবে। হাদিসে এসেছে–

> 'কোনো ঈমানদার স্বামী যেন তার ঈমানদার স্ত্রীকে অপছন্দ না করে। তার কোনো একটি আচরণ অপছন্দ হলেও অন্যটি পছন্দ হবে।' মুসলিম : ১৪৬৯

ইমাম গাজালি বলেন–

> 'জেনে রেখ, স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ মানে শুধু তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা নয়; বরং তার নির্বুদ্ধিতাসূলভ আচরণ ও রাগ সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এটি হবে রাসূল ﷺ-এর আদর্শের অনুসরণ। কারণ, রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণও তাঁর সাথে কথার প্রত্যুত্তর করতেন এবং তাদের কেউ কেউ কোনোদিন রাত পর্যন্ত তাঁর সাথে কথা বলতেন না।' ইহয়াউ উলুমিদ দ্বীন : ২/৪৩

স্ত্রীর দেওয়া কষ্ট সহ্য করা যেমন তার সাথে সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি তার সাথে খেলাধুলা, হাঁসি-ঠাট্টা ও কৌতুক করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে তার মন ভালো থাকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এমনটি করতেন। একবার তিনি হজরত আয়েশা ؓ-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলেন, তখন আয়েশা ؓ জয়লাভ করলেন। এরপর অন্য একদিন আবার প্রতিযোগিতা করলেন এবং এইবার আল্লাহর রাসূল জিতলেন। তখন বললেন, 'এটি আগেরবারের বদলা।' অর্থাৎ বর্তমান সময়ের পরিভাষা অনুযায়ী দুজনে 'ড্র' করেছেন। আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ

একবার হাবশি গোলামগণ যখন মসজিদে বর্শা দিয়ে খেলছিল, তখন আল্লাহর রাসূল আয়েশা ؓ-কে খেলা দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আয়েশা ؓ বলেন, তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার গাল ছিল তাঁর গালের সাথে। আল-লু'লু' ওয়াল মারজান : ৫১৩

রাসূল ﷺ বলেন–

> 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।' ইবনে মাজাহ : ১৯৭৭, তিরমিজি : ৩৮৯৫

তিনি আরও বলেন–

> 'মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক পূর্ণ ঈমানের অধিকারী, যে অধিক সুন্দর চরিত্রের অধিকারী এবং পরিবারের সাথে অধিক কোমল আচরণকারী।' তিরমিজি, নাসায়ি

স্ত্রীদের ওপর স্বামীর যে সকল অধিকারের বিধান রয়েছে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

পরিবারের ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব মানা : এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন–

> 'পুরুষরা নারীদের ওপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।' সূরা নিসা : ৩৪

যেহেতু পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি দুপক্ষের মাঝে একটি যৌথ কোম্পানির মতো। তাই পরিচালক ছাড়া এটি চলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে একসঙ্গে দুজন পরিচালক থাকাও সম্ভব নয়। কারণ, যে নৌকার দুই কান্ডারি থাকে তার পরিণতি হচ্ছে পানিতে ডুবে যাওয়া। নারী পরিবারের পরিচালিকা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তার মাঝে আবেগের প্রাধান্য রয়েছে। এটি তার মাতৃত্বের জন্য আবশ্যক।

অন্যদিকে পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে নারীর ওপর কোনো আর্থিক দায়-দায়িত্ব বর্তায় না। পক্ষান্তরে, পুরুষ পারিবারিক বিষয়াদিতে নারীর চেয়ে অধিক বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের ক্ষেত্রে পরিণাম ও পরিণতির বিষয়ে অধিক সচেতন থাকে। সেইসঙ্গে তার খরচেই গড়ে উঠে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি। কাজেই তার কর্তৃত্ব ধ্বংস হয়ে গেলে পুরো পরিবারই ধ্বংস হয়ে যায়।

নারী কর্তৃক পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার মানে হলো, ন্যায়সংগত বিষয়ে আনুগত্য করা, যেন দুজনের জীবনতরী নিরাপদে চলতে পারে। অনুরূপভাবে নারীর কর্তব্য হলো, ছোটো-বড়ো সবকিছু নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হওয়া। নারী যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মতো স্বীয় কর্তব্য পালনার্থে স্বামীকে মেনে চলে, তবে এটি তার নেক আমল হিসেবে গণ্য হবে, যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদিসে এসেছে–

> 'নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তবে সে যেকোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।' তাবরানি ও আহমাদ

তবে এর অর্থ এই নয় যে, পুরুষ তার পরিবারে স্বৈরশাসন চালাবে এবং স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা বা পরামর্শ ছাড়া স্বৈরশাসকের মতো আদেশ-নিষেধ জারি করবে। মোটেও নয়; বরং পুরুষের উচিত পারবারিক বিভিন্ন বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা এবং তার চিন্তা-ভাবনায় স্ত্রীকে শরিক করা। এতে হয়তো তার থেকে এমন কোনো পরামর্শ পাওয়া যাবে, যা অধিক কল্যাণকর হবে।

আল্লাহ তায়ালা বাচ্চাদের দুগ্ধপানের বিষয়ে পিতা-মাতার ভূমিকা সম্পর্কে বলেন–

> 'অতঃপর তারা (পিতা-মাতা) যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোনো পাপ হবে না।' সূরা বাকারাহ : ২৩৩

হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করেছিলেন। তখন নবি ﷺ উম্মে সালামার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেছেন এবং তাতে কল্যাণ ছিল।

স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ : এ ব্যাপারে ত্রুটি না করা। এমনকী স্বামীর স্পষ্ট বা ইঙ্গিতমূলক অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ হতে সাদাকা দেওয়াও জায়েজ নেই। তার অনুমতিতে দান করলে স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে সওয়াবে অংশীদার হবে। স্বামী যদি সামর্থ্য থাকা স্বত্তেও স্ত্রীর যথোপুযুক্ত ভরণ-পোষণ প্রদানে ত্রুটি করে, তবে স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়াই অপচয় ও অপব্যায় ব্যতীত উপযুক্ত পরিমাণ মাল নিতে পারবে। নবি করিম ﷺ আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাকে বলেছেন–

> 'তোমার নিজের জন্য এবং সন্তানের জন্য ন্যায়সংগতভাবে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পরিমাণ সম্পদ তুমি নিতে পারবে।'

তার অনুপস্থিতে নিজের হেফাজত : স্বামীর অনুপস্থিতে মাহরাম ছাড়া অন্য কোনো আত্মীয়কে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। বিশেষ করে নিজের গায়রে মাহরাম পুরুষ আত্মীয় বা শ্বশুরপক্ষের গায়রে মাহরাম আত্মীয়। হাদিসে এসেছে–

> 'তোমরা নারীদের ঘরে প্রবেশ করো না। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, শশুরপক্ষের পুরুষ আত্মীয়দের ব্যাপারে কী বলেন? তিনি বললেন– শ্বশুরপক্ষের পুরুষ আত্মীয়গণ হলো মৃত্যু সমতুল্য।' বুখারি : ৫২৩২, মুসলিম : ২১৭২

সাধারণত আত্মীয়গণ দীর্ঘ সময় অবস্থান করে এবং অনেক কথাবার্তা বলে। ফলে এতে অনেক সময় তার প্রশান্তি বিনষ্ট হয় এবং বিরক্তি সৃষ্টি হয়। উপরন্তু ফেতনার সম্ভাবনা তো আছেই।

স্বামীর সন্তানের যত্ন : সন্তানদের সুন্দরভাবে প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করা। প্রথম কয়েক বছর সন্তান প্রতিপালনে স্ত্রীর ভূমিকা স্বামীর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সে সময় সন্তান মায়ের কাছে বেশি থাকে এবং পিতার চেয়ে মায়ের কাছেই বেশি শেখে।

এ ব্যাপারে কবি বলেন–

> 'মা হলো এমন একটি শিক্ষালয়স্বরূপ, যাকে তুমি যদি ঠিকভাবে প্রস্তুত করো, তবে তুমি যেন উত্তম মৌলিকত্বসম্পন্ন একটা জাতি তৈরি করলে।'

বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসে এসেছে–

> 'নারী তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীল, সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।' বুখারি : ৮৯৩

স্বামীকে কল্যাণকর কাজে সহায়তা : স্বামীকে কল্যাণকর কাজে, নেক আমলে এবং গোনাহ হতে বাঁচতে সহায়তা করা। স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে তার কাছে এমন কিছু না চাওয়া, যেন সে হারাম উপার্জনে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়; বরং এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক করা। যেমন আগেকার যুগের নেককার লোকদের স্ত্রীগণ স্বামীদের উদ্দেশ্যে বলতেন–

> 'হারাম উপার্জন হতে বেঁচে থাকো। আমরা ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে পারব, কিন্তু জাহান্নামের শাস্তি সইতে পারব না।'

একবার এক লোক জিহাদ বা এ জাতীয় কোনো নেক কাজে বের হয়েছিল। তখন প্রতিবেশীগণ তার স্ত্রীকে বলল, 'তুমি তার সফরের ব্যাপারে রাজি হয়েছে কেন? অথচ সে তোমার জন্য কোনো অর্থ রেখে যায়নি!'

জবাবে তার স্ত্রী বলল, 'আমি যখন থেকে তাকে চিনি, তখন থেকেই তাকে ভক্ষণকারী হিসেবে চিনি! কখনো তো তাকে রিজিকদাতা হিসেবে দেখিনি। আমার তো রিজিকদাতা রব আছেন। ভক্ষণকারী চলে গেছে, কিন্তু রিজিকদাতা রয়ে গেছেন।'

স্বামীর দেওয়া কষ্টে সবর : স্বামীর দেওয়া কষ্টে সবর করা এবং তাকে সহ্য করা। যেমনিভাবে স্বামীকেও স্ত্রীর দেওয়া কষ্টে সবর করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে, জীবনের সুখ-দুঃখ মেনে নেওয়া। জীবনকে স্বপ্নীল ফুলশয্যা মনে না করা। স্বামীর দুঃখ-কষ্টে তার পাশে থাকা। তার দুঃখ, চিন্তায় অংশীদার হওয়া; এমনকী যদি সে মাঝে মাঝে তার প্রতি কোনোরূপ কঠোরতাও করে। এভাবে চলতে পারলে সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় দাম্পত্য জীবন অব্যাহত থাকবে।

২. নিয়ম অনুযায়ী ন্যায়সংগত আচরণ

অন্য আরেকটি বিষয় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তা হলো– 'মারুফ' বা নিয়মানুগ আচরণ। 'মারুফ' শব্দটির উদ্দেশ্য হলো পুণ্য ও ভালো মানুষদের আচরণ, সুষ্ঠু স্বভাবসুলভ আচরণ এবং উত্তম বিবেক সমর্থিত আচরণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে নিয়মানুগ ন্যায়সংগত আচরণ করো।' নিসা : ১৯
>
> 'আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার ওপর সে সমস্ত (দুগ্ধপানকারিনী) নারীর খোরপোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী।' বাকারা : ২৩৩
>
> 'নারীদের তেমনি নিয়মানুগ ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমনিভাবে তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার আছে।' বাকারা : ২২৮
>
> 'অতঃপর তারা যখন নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়মানুযায়ী তাদের রেখে দাও অথবা সহানুভূতির সঙ্গে তাদের মুক্ত করে দাও।' বাকারা : ২৩১

'মারুফ' বা সাধারণ নিয়ম হিসেবে বিভিন্ন বিধিবিধান নির্ধারিত হয়। যেমন : ন্যায়সংগত প্রচলন এবং সাধারণ নিয়মানুযায়ী স্ত্রীর আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণের খরচের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সদাচরণ নির্ধারিত হবে ন্যায়সংগত প্রচলনের আলোকে। কারণ, সদাচরণের খুঁটিনাটি বিস্তারিত বিবরণ শরিয়তের পক্ষ হতে নির্ধারণ করে দেওয়া যৌক্তিক নয়; বরং যে সকল ন্যায়সংগত আচরণ ঈমানদার নেক মানুষদের নিকট স্বীকৃত এবং সাধারণ মুসলিমদের নিকট সন্তোষজনক, সে সকল উত্তম আচরণ ইসলামি শরিয়তেও সদাচরণ হিসেবে গৃহীত। যেমন :

> আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন– 'মুসলিমগণ যা ভালো মনে করে, তা আল্লাহর নিকটও ভালো। আর মুসলিমগণ যা খারাপ মনে করে, তা আল্লাহর নিকটও খারাপ।'

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, পরবর্তী সময়ে আল্লাহ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রসূল ও মুসলমানগণ।' সূরা তাওবাহ : ১০৫

এখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) আমল দেখার পর মুমিনদের দেখাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেখার পর আসে তাদের গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টিও।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন–

> 'যারা নিজেদের কাছে আগত কোনো দলিল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের প্রত্যেকজন আল্লাহ ও মুমিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক।' সূরা মুমিন : ৩৫

এখানে আল্লাহর অসন্তোষের পর মুমিনদের অসন্তোষকেও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এ জন্যই ইলমে ফিকহের জনৈক গবেষক বলেন–

> 'শরিয়তে প্রচলিত নিয়মকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়,
> তাই তো এর ওপর ভিত্তি করে কখনো শরয়ি বিধান বর্ণনা করা হয়।'

অতএব, এ দুটো উপাদান তথা আল্লাহ প্রদত্ত শরয়ি বিধান এবং মানবীয় প্রচলিত নিয়মের মাধ্যমেই আমরা সুষ্ঠু পরিবার ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে পারি, দাম্পত্য জীবনের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারি এবং এ গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বন্ধন অটুট রাখার নিশ্চয়তা দিতে পারি, যা সমাজের ভিত্তিস্বরূপ।

পরিবারের স্থিতিশীলতা

পরিবার যখন গঠিত হয় এবং সুষ্ঠু ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন স্বামী-স্ত্রী দুজনের কর্তব্য হলো তার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। অন্যদিকে সমাজের কর্তব্য হলো– তাদের পারিবারিক বন্ধন রক্ষায় সহযোগিতা করা। অতএব, স্বামী-স্ত্রীর উচিত ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণগুলো প্রশ্রয় না দেওয়া। প্রত্যেকের উচিত একে অপরের ব্যাপারে সবর করা। যেন এ বরকতময় সম্পর্ক অটুট থাকে। দাম্পত্য জীবনের অধিকার আদায়ের বর্ণনায় আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন–

> 'পুরুষের কর্তব্য হলো বিয়ের আগে তার দুই চক্ষু পরিপূর্ণভাবে খুলে রাখা এবং বিয়ের পর তার চোখ অর্ধেকটা মুদে রাখা।'

অর্থাৎ পুরুষের উচিত স্ত্রীর দোষত্রুটি এড়িয়ে চলা এবং ক্ষমা করা।

একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া নারীর জন্য তালাক চাওয়া উচিত নয়।

হাদিসে এসেছে–

> 'যে নারী সমস্যা ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম।' আবু দাউদ : ২২২৬

শরিয়তে তালাক বৈধ হলেও তা কেবল তখনই বৈধ, যখন পারস্পরিক সম্প্রীতি অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং সমঝোতার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

এটি হলো দেহে অস্ত্রোপচারের মতো। যেমন সকল ধরনের ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যর্থ হওয়ার পরই কেবল অস্ত্রোপচার করা হয়, তেমনিভাবে যখন অন্য কোনো উপায় থাকে না, কেবল তখনই বাধ্য হয়ে জরুরি অবস্থার বিধান হিসেবে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

যখন স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে মত-বিরোধ মারাত্মক হয় এবং তা নিজেরা মিটিয়ে ফেলতে পারে না, তখন ইসলাম তাদের মধ্যে সমঝোতার জন্য সামাজিক হস্তক্ষেপ আবশ্যক করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।' সূরা আন-নিসা : ৩৫

বর্তমান যুগে মুসলিমগণ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ মেটানোর জন্য কুরআনের নির্দেশিত 'পারিবারিক পরিষদ' বা 'পারিবারিক আদালত' গঠনের মাধ্যমে মীমাংসার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করছে; বরং তুচ্ছ কারণে, আবার কখনো-বা বিনা কারণেই তালাক দিচ্ছে। যদি তারা আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে চলত এবং ন্যায়সংগত নিয়ম অনুসরণ করত, তবে পারিবারিক বন্ধন রক্ষা এবং এর স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সক্ষম হতো। ফলে এর বরকতময় ফলাফলও লাভ করত।

বিনা কারণে, অপ্রয়োজনে নারীকে তালাক দেওয়াকে আমি হারাম মনে করি। কারণ, এর ফলে এমন একটি বন্ধন ধ্বংস করা হয়, যা গঠনে প্রচুর শ্রম দিতে হয়েছে। অন্যদিকে এর ফলে নারীর কোনো প্রকার অপরাধ কিংবা পুরুষের কোনো প্রয়োজন ব্যতীত বিনা কারণে একটি দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করা হয়।

কাজি আবু ইয়ালা বলেছেন, এটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ -এর একটি মত বর্ণিত আছে। যেমন ইবনে কুদামা তাঁর *আল-মুগনি* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, এ ধরনের তালাক হারাম। কারণ, এতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষতি সাধিত হয় এবং স্বার্থহানি ঘটে। অতএব, এটি বিনা প্রয়োজনে সম্পদ নষ্ট করার মতো হারাম। কারণ, নবি ﷺ বলেছেন– 'ক্ষতি করা উচিত নয়, আর ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয়।' মুসনাদে আহমাদ, ইবনু মাজাহ

এ জন্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদমান সমস্যা মীমাংসা করে দেওয়া আল্লাহর নিকট অন্যতম উত্তম আমল হিসেবে পরিগণিত। বিপরিত দিকে তাদের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট করা অন্যতম নিকৃষ্ট কাজ হিসেবে বিবেচিত। যে ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করে, সে কবিরা গোনাহে লিপ্ত হয়। কুরআনে যে সকল কাফির, জাদুকরদের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে, তারাও এ কাজ করত। আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে বলেন–

> 'অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যা দিয়ে যেন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।'

অতঃপর বলেন–

> 'যা তাদের উপকার না করে ক্ষতি করে, তারা তাই শেখে।' সূরা বাকারাহ : ১০২

এমনিভাবে যে ব্যক্তি স্বামীর সাথে কোনো নারীর সম্পর্ক বিনষ্ট করবে, তার সাথে রাসূলে কারিম ﷺ-এর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তিনি বলেন–

> 'যে ব্যক্তি স্বামীর সঙ্গে কোনো নারীর সম্পর্ক বিনষ্ট করল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' আস-সুনানুল কুবরা

অনিষ্ট ও ক্ষতিসাধনের হোতা ইবলিসও মনে করে, তার বাহিনীর মাঝে মহান সেই শয়তান, যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ইমাম মুসলিম হজরত জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন–

> রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– 'শয়তান তার সিংহাসন পানির ওপর স্থাপন করে। অতঃপর তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে মর্যাদায় সর্বনিম্ন সে, যে সবচেয়ে বড়ো ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন আসে এবং বলে– "আমি এ কাজ করেছি, ওটা করেছি।" শয়তান তাকে বলে, "তুমি কিছুই করোনি।" অতঃপর তাদের আরেকজন এসে বলে– "আমি কোনো কিছুই ছাড়িনি। এমনকী অমুক ও তার স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছি।" অতঃপর শয়তান তার নিকট যায় এবং বলে– "হ্যাঁ! তুমিই আসল কাজ করেছ।"' মুসলিম : ২৮১৩

কারণ, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ মারাত্মক অনিষ্টতা ও ফাসাদের দরজা খুলে দেয়, যার পরিণতি একমাত্র আল্লাহই জানেন।

১. অবাধ যৌনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো

এবার এমন একটি মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে চাই, যা পারিবারিক ব্যবস্থাসহ সমগ্র মানবজাতির জন্য ধ্বংসের কারণ। অথচ তার মোকাবিলায় মানবজাতি দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারেনি। আর তা হলো– 'অবাধ যৌনতার জীবনদর্শন', যা সকল আসমানি শিক্ষাবিরোধী এবং জমিনের কুপ্রবৃত্তির অনুগামী দর্শন। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলামসহ সকল ধর্মে এ জীবনদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এটি সকল চারিত্রিক ও নৈতিক দর্শনের এবং উচ্চ আদর্শের বিরোধী; যা অর্জনে মানুষকে আত্মিক সাধনা ও প্রবৃত্তির মোকাবিলা করতে হয়। ফলে মানুষ আত্মিক পরিশুদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে।

সকল আসমানি ধর্মে ব্যভিচারকে হারাম করা হয়েছে এবং বড়ো পাপসমূহের মধ্যে অন্যতম পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

তাওরাতের প্রসিদ্ধ দশটি নির্দেশের মধ্যে রয়েছে– 'হত্যা করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না।' ইঞ্জিল মথি : ২৭-২৯/৫

হত্যা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে এবং ব্যভিচার নিষিদ্ধ করে মানুষের সম্মান ও বংশ রক্ষা করা হয়েছে। অন্যদিকে চুরি নিষিদ্ধ করে সম্পদ ও মালিকানা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঈসা মসিহ (আ.) এতে আরও যোগ করে বলেন–

> 'তোমরা শুনেছ যে, বলা হয়েছে ব্যভিচার করো না। আর আমি তোমাদের বলছি– যে ব্যক্তি কামনার সাথে কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করল, সে যেন মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো! যদি তোমার ডান চোখ তোমার জন্য ফাঁদ হয়ে থাকে, তবে তা উপড়ে ছুড়ে ফেলে দাও। কারণ, তোমার পূর্ণ দেহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে দেহের কোনো অঙ্গ হারানো তোমার জন্য অধিক উত্তম।' Book of Exodus : 13-15/20

ইসলাম ব্যভিচারকে আরও কঠিনভাবে হারাম করেছে। এটিকে শুধু নিষেধই করেনি; বরং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হতেও বারণ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর তোমরা ব্যভিচারের ধারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।' সূরা আল-ইসরা : ৩২

এর উদ্দেশ্য হলো সে সকল প্রাথমিক কাজ করতে নিষেধ করা, যা ব্যভিচারের পথ সুগম করতে পারে। যেমন : বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে স্পর্শ করা, চুমু দেওয়া, তার সাথে নির্জনে মিলিত হওয়া অথবা কামনার সাথে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি।

এসব কাজ নিষেধ করা হয়েছে কারণ, মানবাত্মার ওপরে মানুষের যৌন প্রবৃত্তির প্রভাব রয়েছে। এমনকী 'ফ্রয়েডের' মনোবিজ্ঞানে মানুষের পূর্ণ আচরণকে যৌন প্রবৃত্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে ঈসা (আ.)-এর পক্ষ হতে বর্ণিত কুদৃষ্টি হারামের সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষার মিল রয়েছে।

এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন–

> 'দুচোখ জিনা করে। তার জিনা হয় দৃষ্টির মাধ্যমে। দুই কান জিনা করে। তার জিনা হয় শোনার মাধ্যমে। জবান জিনা করে। তার জিনা হয় কথার মাধ্যমে। হাত জিনায় লিপ্ত হয়। তার জিনা হয় স্পর্শের মাধ্যমে। পায়ের জিনা হয় (ব্যভিচারের পথে) হাঁটার মাধ্যমে। অন্তর জিনার বাসনা ও কামনা করে, আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়ন করে।' বুখারি : ৬২৪৩, মুসলিম : ২৬৫৭

অন্য বর্ণনায় এসেছে–

> 'মুখও জিনা করে। তার জিনা হচ্ছে চুমু দেওয়া।' মুসলিম : ২৬৫৭

মানবজাতি সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রের স্বভাব আঁকড়ে ছিল। কিছু ব্যতিক্রমী সমাজ ছাড়া সর্বত্রই অশ্লীলতা ছিল বিরল ও গোপনীয়। কিন্তু বর্তমানে যে আধুনিক সভ্যতা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তা নবিদের প্রদর্শিত চারিত্রিক মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সকল বন্ধন ছিন্ন করার জন্য সজোরে আহ্বান জানাচ্ছে, যেন মানুষ যেকোনো উপায়ে যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য প্রবৃত্তির পেছনে ছোটে! অথচ এভাবে মানুষ শেষ পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হতে পারে না; বরং তারা যতই পান করছে, ততই যেন পিপাসা বেড়ে চলেছে।

এভাবে আমরা দেখছি, মানুষ ধীরে ধীরে শালীন পোশাক ত্যাগ করছে। কেউ কেউ সম্পূর্ণ উলঙ্গতায় উপনীত হয়েছে। উলঙ্গদের সংস্থা ও ক্লাব তৈরি হয়েছে এবং তারা স্পষ্টভাবে উলঙ্গপনার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে।

কোনো কোনো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, তারা টিনেজার কোনো মেয়ের সতীত্ব টিকে থাকাকে লজ্জাজনক মনে করে। বিবাহ ছাড়া হাজারো; এমনকী লাখো কুমারী গর্ভবতী হচ্ছে। কোনো ধরনের শর্ত ছাড়া গর্ভপাতের বৈধতা দেওয়ার জন্য দাবি উঠেছে। কোনো কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তিতে তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর পক্ষে সাফাই গাওয়া হয়েছে। যেমনটা ১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মকালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত 'অধিবাসী সম্মেলনে' আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ সম্মেলনে এবং এরপরে আরও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যৌন স্বাধীনতার পথে সকল বাধা উঠিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতিনিধিগণ এসব ধ্বংসাত্মক আহ্বানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, যা সকল নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের মূলোৎপাটন করতে চায়।

তবে হ্যাঁ, আল আজহার, ভ্যাটিকান, মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ ও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিনিধিগণ সেই যৌন স্বাধীনতার মোকাবিলায় অবস্থান নিয়েছে, যা হারাম বা নিষেধ বলতে কোনো কিছু বাকি রাখতে চায় না। এ মতবাদের প্রবক্তাদের ভাষ্য হলো– নিষিদ্ধ হওয়ার যুগ শেষ! এখন আমরা আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছি। এ যুগে যৌন চাহিদা পূরণ করার নিমিত্তে যা খুশি করা বৈধ! ইসলামের নবি ﷺ যথার্থই বলেছেন–

> 'মানুষ পূর্ববর্তী নবিদের যে সকল বাণী পেয়েছে, তার অন্যতম হলো– তোমার লজ্জা না থাকলে তুমি যাচ্ছেতাই করতে পারো।'
> মুসনাদে আহমাদ : ১৭০৯০

বর্তমানে মানবতা যে ধ্বংসাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তা হলো অশ্লীলতা ও অবাধ যৌনাচারের বিপদ। এর ফলে মানবজাতি এমন সব দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে, যার চিকিৎসা আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। যেমন : এইডস, যার কারণে লাখো মানুষ মৃত্যু ও সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে।

এ ছাড়াও রয়েছে আত্মিক ও চারিত্রিক ব্যাধি, যার কারণে বিশাল জ্ঞান ও সম্পদ অর্জন করেও তারা মানবসমাজ ও পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে।

কবির ভাষায়–

> 'সে জাতির স্থাপনাগুলো আবাদময় নয়
> যাদের চরিত্রগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।'

এ ব্যাপারেই নবি মুহাম্মাদ ﷺ সতর্ক করে বলেছেন–

> 'কোনো জাতির মাঝে যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতা দেখা দেয়, এমনকী তারা তা প্রকাশ্যে করে বেড়ায়, তবে তাদের মধ্যে এমন সব ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে, যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিল না।' ইবনে মাজাহ : ৪০১৯

তিনি আরও বলেন–

> 'কোনো জনপদের অধিবাসীদের মাঝে প্রকাশ্যে ব্যভিচার ও সুদ দেখা দিলে তারা নিজেদের ওপর আল্লাহর আজাবকে বৈধ করে নেয়।' মুসতাদরাকে হাকিম : ২৭/২

ব্যাভিচার চারিত্রিক বিপর্যয়ের আর সুদ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ। যখন এ দুটো একত্রিত হয়, তখন ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়; বিশেষ করে যখন তা প্রকাশ্যে দাম্ভিকতার সঙ্গে করা হয়।

পশ্চিমা সংস্কারপন্থি, চিন্তাশীল সমালোচকগণও অবাধ যৌনতা প্রসারের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, মানবজাতির জন্য অবাধ যৌনতা পরমাণু বোমার চেয়েও মারাত্মক।

২. সমকামিতার প্রচলন

ব্যভিচারের অশ্লীলতার চেয়ে মারাত্মক বিপদ হলো সমকামিতার অশ্লীলতা, যা সকল ধর্মেই নিষিদ্ধ। অতীত ইতিহাসে একমাত্র 'কওমে লুত' ব্যতীত আর কোথাও এটি দেখা যায়নি। সর্বপ্রথম তারাই এ অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়েছিল।

তাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউ এটা করেনি। তাদের মাঝে এ অভ্যাস নেশার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।

এমনকী তারা কোনো লজ্জা ছাড়াই লুত (আ.)-এর মেহমানদের সাথেও এই অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে ওত পেতে ছিল! অথচ লুত (আ.) তাদের এ বলে নিষেধ করেছিলেন–

> 'সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম করো? তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন করো? তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' সূরা শুআরা : ১৬৫, ১৬৬

অন্য সূরাতে এসেছে, তিনি তাদেরকে বলেছেন–

> 'তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়।' সূরা নামল : ৫৫

আরও বলেছেন–

> 'বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করছ।' সূরা আ'রাফ : ৮১

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।' সূরা আনকাবুত : ৩০

তিনি আরও বলেন–

> 'আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি।' সূরা আহকাফ : ২৫

এভাবে আমরা দেখছি– আল্লাহ তায়ালা তাদের সীমালঙ্ঘনকারী, বর্বর, অপরাধী ও দুষ্কৃতকারী বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, তারা আল্লাহর দেওয়া মানবীয় সুষ্ঠু স্বভাব পরিবর্তন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বলল, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা শুধু পাক-পবিত্র সাজতে চায়।' সূরা আন-নামল : ৫৬

এমনকী অশ্লীলতা হতে বিরত থাকাকে তারা এমন অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করল, যার দরুন ভালো লোকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা আবশ্যক মনে করেছিল! তখন নিষিদ্ধ বিধানকে তুচ্ছ প্রতিপন্নকারী এ সকল অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার কুদরতি হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। তাদের দুই ধরনের আসমানি শাস্তি দেওয়া হলো। একটি হলো তাদের জনপদকে উলটিয়ে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেওয়া। অন্যটি হলো পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'এবং তার ওপর স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেটি পাপীষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়।' সূরা হুদ : ৮২-৮৩

এ অপরাধ সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা এসেছে। তাওরাতেও সামুদ জনপদের দুষ্কৃতির আলোচনায় এ ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে–

> যখন তাদের অন্যায় ও অশ্লীলতা প্রসারতা লাভ করেছে, তখন তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার আজাব নেমে এসেছে এবং সেই জনপদ পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। Book of Exodus : 1-30/19

এ অপরাধ সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের পবিত্র গ্রন্থেও সতর্ক করা হয়েছে। পল বলেন–

> 'পুরুষ পুরুষের সাথে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে তারা নিজেদের ভ্রান্তির ন্যায্য শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে।' রোমের উদ্দেশ্যে পলের চিঠি : ২৭/১

অথচ আজ সব ধরনের প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে এই অশ্লীল কাজের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। মানুষের মাঝে প্রসার ঘটানো হচ্ছে। এর পক্ষে আওয়াজ তোলা হচ্ছে। সরকারি সংস্থা গড়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশের সংসদে এর পক্ষে ওকালতি করা হচ্ছে। এমনকী সমকামীদের সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন চ্যানেলও রয়েছে।

তারা প্রকাশ্যে, একই লিঙ্গের দুই পুরুষ বা দুই নারীর পরিবার গঠনের জন্য অর্থাৎ পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে বিবাহ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে! আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিবাহ সংগঠিত হবে এবং তা সরকারি কর্তৃপক্ষের

মাধ্যমে সত্যায়িত হবে! এই ঘৃণ্য কাজকে আবার কোনো কোনো আধুনিকতাবাদী উচ্চবিলাসী পাদরি আশীর্বাদ করছে। নেতৃত্ব ধরে রাখতে বা ক্ষমতার পতন ঘটাতে সমকামীদের প্রভাব রয়েছে বলে কোনো কোনো পশ্চিমা সরকার তাদের তোষামোদ করার জন্য সমকামী বিবাহ স্বীকৃতি দিয়েছে!

এ বছরের (২০০৪ সালে) গ্রীষ্মকালে জায়োনবাদী ইহুদি লবির নেতৃত্বে আমার বিরুদ্ধে লন্ডনে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তার মধ্যে একটি ছিল- আমি সমকামিতা ও সমকামীদের বিরোধিতা করি এবং তাদের ব্যাপারে আমার ভূমিকা আক্রমনাত্মক!

আমার সাথে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম তথা সংবাদপত্র, রেডিও ও টিভির প্রতিনিধিগণ সাক্ষাৎ করেন। আমাকে প্রশ্ন করেন, সমকামিতা ও সমকামীদের ব্যাপারে আপনার স্পষ্ট মতামত কী? তাদের বললাম, সত্যি বলতে এ বিষয়ে আমার বিশেষ কোনো মতামত নেই। আমার মতামত তা-ই, যা সকল আসমানি ধর্ম তথা ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ যা তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এসেছে। আমার মত তা-ই, যা ভ্যাটিকানের পোপ বলেছেন, অন্যান্য খ্রিষ্টান পাদরিগণ বলেছেন, ইহুদি ধর্মগুরুগণ বলেছেন এবং সর্বত্র চারিত্রিক মূল্যবোধের প্রবক্তাগণ বলেছেন।

এ মারাত্মক চারিত্রিক বিকৃতির বিরোধিতায় ধর্ম মান্যকারী কোনো ব্যক্তির অবস্থান লুত (আ.)-এর চেয়ে ব্যতিক্রম হতে পারে না। কারণ, সমকামিতায় লিপ্ত বিকৃত রুচির লোকগণ আল্লাহর দেওয়া সুষ্ঠু স্বভাবকে পরিবর্তন করে, নারীর স্থলে পুরুষকে গ্রহণ করে নারীর চাহিদা পূরণকে অবহেলা করে।

মানবজাতি যদি সেসব বিকৃত চরিত্রের লোকদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের এ অন্যায় চিন্তা মেনে নেয়, তবে এক প্রজন্ম পরেই মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটবে। কারণ, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ব্যতীত বংশ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। আর এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহের বিধান করেছেন।

মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের পারস্পরিক সম্পূরকতা

পরিবার হলো সমাজ টিকে থাকার জন্য সর্বপ্রথম এবং অত্যাবশ্যক একটি উপাদান। এটি এমন একটি উষ্ণ ক্রোড়, যার ছায়ায় গঠিত হয় ভালোবাসা, পারস্পরিক দয়া-মায়া এবং পরার্থপরতার অনুভূতি। এটি পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মানবজাতির টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম।

পরিবার শুরু হয় স্বামী-স্ত্রী তথা একজন নারী ও একজন পুরুষের মাধ্যমে, যাদের মাঝে থাকে শরিয়তসম্মত বিবাহের পবিত্র বন্ধন। এতে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করেন এবং মানুষ এই সম্পর্ককে সম্মান করে। পরিবার মূলত অনেকগুলো অধিকার ও কর্তব্যের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।

সন্তান আল্লাহর বিশেষ উপহার

অতঃপর সন্তান লাভের পর এই ছোটো পরিবার ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। সন্তান লাভ করা বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন। সূরা নাহল : ৭২

সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, কুরআনে তাকে আল্লাহর দেওয়া বিশেষ উপহার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই।' সূরা শুরা : ৪৯-৫০

অন্যদিকে জাহেলি যুগের লোকেরা কন্যা সন্তান জন্মের ফলে রুষ্ট ও বিরক্ত হতো। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, নাকি তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখো, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।' সূরা নাহল : ৫৮-৫৯

অনেক ক্ষেত্রে জাহেলি চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা কন্যা সন্তানকে নিকৃষ্ট উপায়ে হত্যা করত, জীবন্ত পুঁতে ফেলত। এটি ছিল মানুষের অন্যতম পবিত্র পিতৃত্বের মায়ার ওপর সংঘটিত জাহেলিয়াতের মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্য করা হলো?' সূরা তাকবির : ৮-৯

জাহেলি সমাজ মানুষের মায়া ও আবেগের সাথে জঘন্য প্রতারণা করেছে। উক্ত সমাজ দারিদ্রতা অথবা সম্ভাবনাময় দারিদ্রতার ভয়ে মানুষকে দিয়ে নিজের সন্তান হত্যা করাতো। মানুষ তার সন্তানকে খাওয়ানোর ভয়ে হত্যা করত! অথচ তার কর্তব্য ছিল সন্তানকে রক্ষা করা; নিজের পেট ভরার জন্য হত্যা করা কিংবা ক্ষুধার্ত রাখা নয়।

অনুরূপভাবে জাহেলি সমাজ মানুষের বিবেকের ওপর জুলুম করেছে। কারণ, আমরা দেখতে পাই– তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজ হাতে খোদাই করা পাথরের পূজা করত এবং তাকে সিজদা করত।

সন্তানের জন্ম থেকেই মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের সৃষ্টি

পরিবারে সন্তান জন্মের সাথে সাথেই মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের সৃষ্টি হয়। এ দুটো বিষয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ; উষ্ণ স্নেহ ও ভালোবাসার অপূর্ব উৎস।

মাতৃত্ব হচ্ছে সন্তানের প্রতি মায়ের অবারিত দান। মা শুধু দিয়েই যান, কিন্তু বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করেন না। কোনো স্বার্থ ছাড়াই আত্মত্যাগ করে যান। মা সন্তানের জন্য তার স্বাস্থ্য, যৌবন ও শান্তি সবই দিয়ে দেন, কিন্তু এসবের জন্য খোঁটা দেন না। সন্তানের ঘুমের জন্য রাত জাগা এবং তার শান্তির জন্য কষ্ট করাকে তিনি উপভোগ করেন। সেইসঙ্গে সন্তানকে খাওয়ানো এবং বড়ো করার জন্য নিজে ক্ষুধার্ত থাকার কষ্ট উপভোগ করেন।

মা সন্তানের জন্য ঘরের ভেতরে কষ্ট করেন। আর বাবা সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচ জোগানোর জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাইরে পরিশ্রম করেন।

পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য রয়েছে অনেকগুলো অধিকার ও কর্তব্য।

পিতা-মাতার অধিকার

ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সকল সন্তানের ওপর পিতা-মাতার প্রথম অধিকার হচ্ছে– তাদের সাথে সদ্‌ব্যবহার ও সদাচারণ করা। সকল আসমানি ধর্মে এ অধিকারের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে।

তাওরাতে বর্ণিত দশটি নির্দেশনার মাঝে রয়েছে–

> 'তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান করো।' Book of Exodus : 13-15/20

এমনিভাবে ঈসা (আ.)-এর ইঞ্জিলেও নির্দেশ এসেছে।

আর কুরআনে এ ব্যাপারে এমনভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, যার নজির পৃথিবীর আর কোনো ধর্মে নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর ইবাদত করো আল্লাহর, তাঁর সাথে অপর কাউকে শরিক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো।' নিসা : ৩৬

আরও ইরশাদ করেন–

> 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্‌ব্যবহার করো।' সূরা ইসরা : ২৩

অন্যত্র বলেন–

> 'আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।' সূরা লুকমান : ১৪

যেহেতু তাওহিদের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদ্‌ব্যবহারের গুরুত্ব, তাই শিরকের পরে মারাত্মক গোনাহ হচ্ছে তাদের অবাধ্য হওয়া। নবি করিম ﷺ এটিকে অন্যতম মারাত্মক কবিরা গোনাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

পিতা-মাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়, দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেখাশোনা ও যত্নের মুখাপেক্ষী হয়, তখন তাদের সাথে সদ্‌ব্যবহার ও সদাচরণের জন্য ইসলামে অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সময় তাদের অনুভূতি খুবই আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল থাকে। যেকোনো অনুপযুক্ত কথা যেমন বিরক্তি প্রকাশকারী, তেমনি 'উফ' শব্দও তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্‌ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং ধমক দিও না এবং তাদের সাথে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা বলো। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে বাহু নত করে দাও এবং বলো : হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।' বনি ইসরাইল : ২৩-২৪

মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহর

কুরআনে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হলেও পিতার কষ্টের চেয়ে মাতার কষ্টের কথা বেশি বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।' সূরা লুকমান : ১৪

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন–

> 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।' সূরা আহকাফ : ১৫

আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মায়ের ব্যথা ও কষ্টসমূহ তথা গর্ভ, সন্তান প্রসব ও দুধ পান করার কথা উল্লেখ করেছেন।

এ জন্যই আল্লাহর রাসূল ﷺ মায়ের ব্যাপারে তিনবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পিতার ব্যাপারে একবার নির্দেশ দিয়েছেন। যখন একজন সাহাবি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন–

> 'মানুষের মধ্যে সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত কে? তখন তিনি বললেন, 'তোমার মা।' জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কে?' বললেন, 'তোমার মা।' আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কে?' বললেন, 'তোমার মা।' আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কে?' বললেন, 'তোমার পিতা।' বুখারি : ৫৯৭১, মুসলিম : ২৫৪৮

তিনি আরও বলেন–

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে মায়ের সাথে সদ্‌ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, তারপর তোমাদেরকে মায়ের সাথে সদ্‌ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, তারপর তোমাদেরকে মায়ের সাথে সদ্‌ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, তারপর তোমাদেরকে পিতার সাথে সদ্‌ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর পর্যায়ক্রমে নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।' তাবরানি, বাইহাকি ও ইবনে মাজাহ

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো আলেম বলেন, সদ্‌ব্যবহারের তিন-চতুর্থাংশ মায়ের অধিকার আর এক-চতুর্থাংশ বাবার। কারণ, মা এমনসব কষ্ট সহ্য করেন, যা বাবাকে করতে হয় না, আর সে কারণেই মায়ের জন্য সন্তানের সদ্‌ব্যবহার অধিক প্রয়োজন। পিতা তার সম্পদ দ্বারা নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে, কিন্তু মা পারে না। অন্যদিকে সন্তানগণ মায়ের সাথে যে আচরণের সাহস করতে পারে, বাবার সাথে তা পারে না।

সমাজের ওপর মাতৃত্বের অধিকার

পিতা-মাতার দেখাশোনা করার দায়িত্ব কেবল সন্তানের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পুরো সমাজব্যাপী বিস্তৃত। সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে– সন্তান প্রসব পর্যন্ত নারীর মাতৃত্বের যত্ন নেওয়া এবং শান্তি ও নিরাপত্তার মাঝে তাকে খাদ্য, চিকিৎসা ও সামাজিক সেবা দিয়ে সহযোগিতা করা।

মা যদি কর্মজীবী হয়, তবে গর্ভাবস্থায় তার চাকরির কাজ হালকা করতে হবে; বিশেষ করে গর্ভের শেষ দিনগুলোতে। সন্তান প্রসবের পর তাকে উপযুক্ত মাতৃত্ব ও দুগ্ধ পানকালীন ছুটি দিতে হবে।

সেই ছুটি হয়তো এমনও হতে পারে, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে–

'আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুবছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়ানোর পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়।' সূরা আল-বাকারা : ২৩৩

উক্ত সময়কালে তাদের পূর্ণ বেতনসহ ছুটি দিতে হবে। কারণ, ওই মা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে। আর তা হলো– নবাগত প্রজন্মকে প্রতিপালন করছে। মাতৃজাতি প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনকারী জাতি। তারা ধন-সম্পদ উৎপাদন করে না; মানুষ উৎপাদন করে।

অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক গ্যারি বেকের কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে একটি বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি বলেন–

> 'বাচ্চাদের যত্ন ও প্রতিপালনের জন্য যে সকল নারী ঘরে থাকেন, তারা জাতীয় অর্থনীতির উন্নতিতে ২৫% থেকে ৫০% হারে অংশগ্রহণ করেন। অথচ এই তথ্য অনেকেই জানে না। অনেকে মনে করে, যে সকল নারী ঘরের দায়িত্ব পালন করেন, তারা বেকার। তাদের দৃষ্টিতে, নারীগণ জাতীয় উৎপাদনের ওপর বোঝাস্বরূপ! অথচ আমরা দেখছি, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি তার বিপরীত স্বাক্ষ্য দিচ্ছে।'

সমাজের ওপর পিতৃত্বের অধিকার

মায়ের সাথে সাথে পিতার দেখাশোনা করাও সমাজের দায়িত্ব। পিতা সন্তানের জন্য তার কষ্টার্জিত সম্পদ ব্যয় করে। যদি তিনি সংকটে পতিত হন এবং স্ত্রী-সন্তানের অধিকার আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়েন, তবে সমাজের কর্তব্য হলো তার প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। যাতে করে পিতা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্তভাবে সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সকল অধিকার ন্যায়সংগতভাবে আদায় করতে পারে।

মুসলিম সমাজের অর্থই পারস্পরিক সহযোগিতা। এখানে ধনী ব্যক্তিগণ গরিবদের সহযোগিতা করবে, শক্তিশালীগণ দুর্বলের পাশে দাঁড়াবে। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য ইমারতস্বরূপ, যার একাংশ অন্য অংশকে মজবুত করে। মুসলমান মুসলমানের ভাই; না সে তার ওপর জুলুম করে, আর না তাকে অন্য কারও কাছে সমর্পণ করে। অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় তাকে ছেড়ে যায় না।

এ শূন্যতা পূরণ করার জন্য ইসলামে বিভিন্ন বিধান রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করার বিধান রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত শর্ত-সাপেক্ষে ধনী ব্যক্তি গরিব আত্মীয়ের জন্য ব্যয় করবে।

জাকাতের বিধান রাখা হয়েছে– যা ধনীদের থেকে নিয়ে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়। অনুরূপভাবে যে পিতা তার সন্তানের ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম, তাকেও জাকাত প্রদান করতে হবে।

এমনিভাবে গ্রামবাসী অথবা এলাকাবাসীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিধান রয়েছে। ওই ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নয়, যে ভরা পেটে রাত্রিযাপন করে, অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।

অন্যদিকে সাধারণ তাকাফুলের বিধানও রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ হতে প্রজাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুসলিম রাষ্ট্র এ দায়িত্ব পালন করবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সকল ক্ষুধার্তের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা। সকল বস্ত্রহীনের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করা। অসুস্থদের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করা এবং গৃহহীনদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন–

> 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল, তিনি তার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। পিতা তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন।' বুখারি : ৮৯৩

অতএব, পিতা যেমন তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তেমনিভাবে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানও তার অধীনস্থ প্রজাদের দায়িত্বশীল।

সন্তানের অধিকার

জন্মলাভকারী প্রত্যেকটি শিশুর অধিকার হচ্ছে তাকে দেখাশোনার জন্য একজন পিতা থাকা এবং তাকে সস্নেহে প্রতিপালনের জন্য একজন মা থাকা। এটি স্বভাবগতভাবেই প্রয়োজন এবং ধর্ম ও শরিয়তের দৃষ্টিতেও আবশ্যক।

অতএব, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছেন, তার চাহিদা হলো– একজন শিশু পিতা-মাতা তথা নারী-পুরুষ থেকে জন্ম নেবে। যাদের একজনের থাকবে বীর্য, তথা সবেগে নির্গত পানি, আর অন্যজনের থাকবে ডিম্বাণু। আর পুরুষের বীর্য ও নারীর ডিম্বাণু মিলনের মাধ্যমে জরায়ুতে কাঙ্ক্ষিত মানব শিশুর গঠন হয়। অতঃপর মা পূর্ণ সন্তান জন্মদান করেন। এটিই স্বভাবগত বিষয়। ধর্ম ও শরিয়তের দৃষ্টিতে এটিই আবশ্যক।

অর্থাৎ নারী-পুরুষ দুজনে বৈধ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। কুরআনে যাকে 'দৃঢ় চুক্তি' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই বন্ধনে আল্লাহর পক্ষ হতে বরকত রয়েছে। মানুষও এই সম্পর্ককে সম্মান করে। এর মাধ্যমে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তার পিতা-মাতার কাছে রয়েছে অনেক অধিকার। অনুরূপভাবে আত্মীয়স্বজন ও পূর্ণ সমাজের ওপরও তার রয়েছে যত্ন পাওয়ার অধিকার।

অতএব, বীর্যের কারণে পিতার সঙ্গে এবং ডিম্বানু, গর্ভ ও প্রসবের কারণে মায়ের সঙ্গে এ শিশুর যোগসূত্র স্থাপন হওয়া কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মাতৃত্বের প্রকৃত অর্থের মাঝে এবং সদাচরণ ও সদ্ব্যবহারের অধিকার লাভের ক্ষেত্রে এ কষ্টগুলোর গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে।' সূরা লুকমান : ১৪

যারা স্ত্রীর সঙ্গে 'জিহার' করে, অর্থাৎ স্ত্রীকে বলে– 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো!' তাদের জবাবে বলা হয়েছে–

> 'তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদের জন্মদান করেছে।' সূরা মুজাদালাহ : ২

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী মা হলেন সেই নারী, যার সঙ্গে সন্তানের যোগসূত্র স্থাপিত হবে। তেমনিভাবে সেই পিতার সাথেও তার বংশসূত্র স্থাপিত হবে, যার সাথে তার মায়ের বৈধ মিলন হয়েছে এবং ডিম্বানুর সঙ্গে যার বীর্য মিলে গর্ভ সঞ্চার হয়েছে।

এ কারণেই সন্তানকে তার পিতা-মাতার কোনো একজন থেকে বঞ্চিত করা গুরুতর অপরাধ এবং জঘন্য গোনাহের কাজ। যেমনিভাবে, আমরা অবৈধ সন্তানদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। যারা পারিবারিক ব্যবস্থা ছাড়া অবৈধভাবে গর্ভে ধারণ করে, অর্থাৎ বৈধ বিবাহ বন্ধন ছাড়া গর্ভধারণ করে, সেই সকল মা একাই প্রসব, দুধ পান করানো, লালন-পালন ও খরচের ভার বহন করে। অথচ লালন-পালনের অংশীদার বাবার কোনো খোঁজই থাকে না।

এ জন্যই ইসলাম ও অন্যান্য সকল ধর্মে জোর নির্দেশনা এসেছে– শিশুরা যেন স্বাভাবিক বৈধ পরিবারের ছত্র-ছায়ায় জন্মলাভ করে। যেন সে প্রতিপালনপকারী দায়িত্বশীল পিতার দায়িত্বে এবং মমতাময়ী মায়ের ক্রোড়ে বেড়ে উঠতে পারে।

প্রতিটি শিশুর জন্য একজন প্রকৃত মা আবশ্যক; কৃত্রিম মা নয়। অনুরূপভাবে তার জন্য একজন প্রকৃত পিতা থাকা চাই। এমন পিতা নয়, যে তাকে কেবল দত্তক নেবে; অর্থাৎ বাস্তবে পিতা নয়।

যেমনিভাবে কুরআনে বলা হয়েছে–

> 'এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র।' সূরা আহজাব : ৪

প্রকৃত পিতা কেন তার পিতৃত্বের গুরু দায়িত্ব অন্যের ওপর ছেড়ে পালাবে? দাবিদার আর বাস্তব হকদার কখনো এক নয়। মূল আর কৃত্রিম এক হতে পারে না। কেন প্রকৃত পিতা তার সন্তানকে সকলের সামনে এভাবে বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে– ইনি আমার বাবা, ইনি আমার দাদা, এই আমার পরিবার, এই আমার বংশ অথবা গোত্র। কবি ফারাজদাক বলেছেন–

> 'ওরাই আমার পিতৃপুরুষ, পারলে ওদের মতো কারও দৃষ্টান্ত নিয়ে এসো,
> ওহে জারির! যখন কোনো সভায় আমার সঙ্গে একত্রিত হও।'

অবিবাহিতা মাতৃকুল

আজ আধুনিক সভ্যতা যে অবাধ যৌনতার ঢেউ উথলে দিয়েছে, তার কারণেই অবিবাহিত মায়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এটি ব্যভিচারের প্রসারতা ও নারীদের অবৈধভাবে গর্ভধারণের ফল। এর ফলেই আজ ছেলেমেয়েরা

প্রকৃত পিতা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। সে সকল কাপুরুষ পিতা, যারা সামান্য সময়ের জন্য হারাম উপায়ে সম্ভোগের পর দায়িত্বভার গ্রহণ করা থেকে পালিয়ে গেছে এবং সকল কষ্টের বোঝা বহন করার জন্য অসহায় নারীকে ত্যাগ করেছে। অথচ সন্তানটি তাদের দুজনেরই শাখা এবং উভয়ের সমন্বিত সম্ভোগের ফল।

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর কষ্ট

আরও বেশি নিকৃষ্ট ও জঘন্য ব্যাপার হলো– পিতা-মাতা উভয়ে জীবিত থাকা অবস্থায়ও কোনো শিশু তাদের থেকে বঞ্চিত হওয়া! অনেকে কোনো বৈধ বিবাহ ছাড়া সমাজের অগোচরে একত্রে বসবাস ও উপভোগ করছে। অতঃপর গর্ভ সঞ্চার হয়ে যখনই সন্তান প্রসবের সময় হচ্ছে, তখনই পুরুষ লোকটি নারীকে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে।

সেই নারী সমাজের মুখোমুখি হওয়ার ভার নিতে না পেরে হয়তো সন্তানকে রাস্তায় ফেলে যাচ্ছে কিংবা ইয়াতিমখানায় দিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে পিতা-মাতা থাকা সত্ত্বেও সেই শিশু ইয়াতিমের-জীবনযাপন করছে। পিতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, নিজ পরিবারের পরিচয় সে দিতে পারে না। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর-স্নেহ করার মতো কোনো মাকে সে পায় না। এসবই হলো কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের কষ্ট!

মানুষের দীর্ঘ শৈশবকাল

অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের শৈশবকাল বেশ দীর্ঘ। কোনো কোনো প্রাণী বা পাখি জন্মের সাথে সাথেই চলাফেরা করতে পারে। গরুর বাছুর জন্মের পরেই চার পায়ে দাঁড়াতে পারে। অনুরূপভাবে মুরগির বাচ্চা; ডিম থেকেই যেন তার চিৎকার শোনা যায়! কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, হাঁটা-চলা ও কথা বলতে পারা এবং বুঝ ও ভালো-মন্দের পার্থক্য জ্ঞান আসা পর্যন্ত মানুষের জন্য প্রয়োজন যত্ন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা-দীক্ষা, লালন-পালন ও আদব-কায়দার অনুশীলন। আর এসবের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এ সময়ে পিতা-মাতা তাকে ধীরে ধীরে প্রতিপালন করবে এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেবে, যেন সে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে।

যে পিতা-মাতা সন্তানকে জন্ম দিয়েছে, তাদের রয়েছে অনেক দায়িত্ব। যেমনি আছে সন্তানের বৈষয়িক দিকসমূহ দেখার দায়িত্ব, তেমনি রয়েছে তাদের আদব-আখলাক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি দেখার দায়িত্বও।

পিতা-মাতার সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো– সন্তানের দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করা। স্বভাবগতভাবে ও মাতৃত্বের টানে মা তার সন্তানকে দুধ পান করান। যে বয়সে সন্তানের খাবার চর্বণ করার উপযোগী দাঁত থাকে না এবং শক্ত খাবার হজম করার সামর্থ্য থাকে না, সে সময় তার খাবারের জন্য আল্লাহ তায়ালা মায়ের বুকে দুধ সঞ্চার করে দেন। কিন্তু তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা শরীরের ফিটনেস এবং স্তনের উত্থান বজায় রাখতে সন্তানকে বুকের দুধ পান না করে কৃত্রিম দুধ পান করানোর জন্য পরামর্শ দিচ্ছে! অথচ কৃত্রিম দুধ কখনো বুকের দুধের বিকল্প হতে পারে না। সন্তানকে বুকের দুধ পান করানো মানে কেবল তার পেটে দুধ পৌঁছানো নয়; বরং এর অর্থ তার চেয়েও গভীর। এর ফলে সন্তান মায়ের বুকের সঙ্গে মিশে স্নেহের উষ্ণতা অনুভব করে। তাকে জড়িয়ে ধরে একদিকে স্তন থেকে খাবার গ্রহণ করে, অন্যদিকে হৃদয় ও আত্মার উষ্ণতা থেকে মানসিক পুষ্টি গ্রহণ করে।

তালাকপ্রাপ্ত মায়ের কর্তব্য

কোনো কোনো সময় নারী তার সন্তানের পিতা কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে স্ত্রী স্বামীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বা হয়রানি করার জন্য সন্তানকে বুকের দুধ পান করানো থেকে বিরত থাকে। এতে সে সন্তানের কোনো কষ্ট বা ক্ষতির পরোয়া করে না। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারিমের সূরা বাকারায় একটি আয়াত এসেছে, যাতে মায়েদের সন্তানের দুধ পানের অধিকার আদায়ের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর জন্মদাতা পিতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা সন্তানের দুধ পান করানোর পূর্ণ সময়কালে মায়ের ব্যয়ভার বহন করে। পিতা যদি মারা যায়, তবে তার উত্তরাধিকারীগণ ব্যয়ভার বহন করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুবছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়ানোর পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়।

আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ, পিতার ওপর সে সমস্ত নারীর খোরপোষের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। যার সন্তান, তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। ওয়ারিশদের ওপরও একই দায়িত্ব। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহলে দুই বছরের ভেতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোনো পাপ নেই। আর যদি তোমরা কোনো ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদের দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও, তাতেও কোনো পাপ নেই। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভালো করেই দেখেন।' সূরা বাকারাহ : ২৩৩

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে– এ আয়াতে তালাকপ্রাপ্ত মায়েদের কথা বলা হয়েছে। কারণ, এখানে পূর্বাপর আলোচনা তালাকসংক্রান্ত বিধিবিধান নিয়ে। আর তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের পর পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ দেখা দেয়। ফলে তখন নারী হয়তো সন্তানকে দুটো কারণে অবহেলা করে–

এক : সন্তানকে কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে স্বামীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য।

দুই : হয়তো সে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় বলে সন্তানকে অবহেলা করে! তাই মহান আল্লাহ তায়ালা সন্তানের যত্ন নেওয়ার জন্য তালাকপ্রাপ্ত মায়েদের আহ্বান করেছেন। তাফসিরে কাবির : ৬/১২৪

ইমাম রাজি (রহ.) এ আয়াতের তাফসিরে বলেন– আল্লাহ তায়ালা একদিকে যেমন সন্তানের যত্নের বিষয়ে মাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন : 'আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুবছর দুধ খাওয়াবে।' তেমনিভাবে মায়ের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য পিতাকেও নির্দেশ দিয়েছেন। যেন সে সন্তানের যত্ন নিতে সক্ষম হয়। এ জন্য পিতাকে ন্যায়সংগতভাবে খোরপোষ বহন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এটি হচ্ছে সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার পারস্পরিক সহযোগিতার দৃষ্টান্ত। তাফসিরে কাবির : ৬/১২৮

অতঃপর ইমাম রাজি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তা হলো– আল্লাহ তায়ালা প্রথমে মাকে সন্তানের যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর পিতাকে মায়ের যত্ন নিতে বলেছেন। এতে বোঝা যায়, সন্তান প্রতিপালনের জন্য পিতার চেয়ে মাতার প্রয়োজন অধিক বেশি। কারণ, সন্তান প্রতিপালনে মায়ের কোনো মাধ্যম লাগে না। অথচ সন্তানের যত্ন নেওয়ার জন্য পিতার মাধ্যমের প্রয়োজন। কারণ, সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য হয়তো অর্থের বিনিময়ে কোনো নারীকে নিযুক্ত করতে হয় এবং খোরপোষ বহন করতে হয়। এতে বোঝা যাচ্ছে, মায়ের অধিকারে পিতার অধিকারের চেয়ে বেশি। এ ব্যাপারে অনেক প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে।

ইমাম রাজি এ বিষয়ে তৃতীয় আরেকটি মাসয়ালা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন– এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পিতা-মাতা দুজনের সম্মতি এবং অভিজ্ঞদের পরামর্শ ব্যতীত দুই বছরের কমে দুধ ছাড়ানো জায়েজ নেই। কারণ, মা হয়তো কখনো বিরক্ত হয়ে দুধ ছাড়ানোর চেষ্টা করবে। আবার পিতাও হয়তো কখনো খরচ প্রদানে বিরক্ত হয়ে দুধ ছাড়ানোর জন্য বলবে! কিন্তু নিজের প্রয়োজনের খাতিরে সন্তানের ক্ষতি করার ক্ষেত্রে দুজনের একমত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। একমত হলেও, অন্যের সাথে পরামর্শ করতে হবে। কারণ, শিশুর ক্ষতি করার ব্যাপারে সকলে একমত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগে দুধ ছাড়ানোর জন্য সকলে একমত হলে বুঝতে হবে, এতে শিশুর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মহান আল্লাহ শিশুদের ক্ষতি হতে রক্ষা করার জন্য কতক শর্ত জুড়ে দিয়েছেন! অতঃপর সকল শর্ত পূরণ হওয়ার পরও সরাসরি অনুমতি দেননি; বরং বলেছেন– তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। এতে বোঝা যায়– যে মানুষ যত বেশি দুর্বল, তার প্রতি আল্লাহর রহমত ও যত্ন তত বেশি। তাফসিরে কাবির : ৬/১৩২

মায়ের অধিকার

ইসলামি শরিয়তে সন্তানকে শৈশব অবস্থায় খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে পিতা-মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে এবং বিবাদমান অবস্থায়

সন্তানের হক বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তখন সন্তান প্রতিপালনের বিধান কী হবে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সন্তানকে কে প্রতিপালন করবে– মা নাকি বাবা? কোন বয়স পর্যন্ত কে প্রতিপালন করবে এবং প্রতিপালিত সন্তানের খরচ কে বহন করবে ইত্যাদি বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর (সুনান) গ্রন্থে সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﵁ হতে বর্ণনা করেন–

> 'একবার এক মহিলা রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল– "হে আল্লাহর রাসূল! এই সন্তানের জন্য আমার পেট ছিল থাকার স্থান। আমার স্তন তার পানপাত্র, আর আমার কোল তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে আমার সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে!" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন– (পুনরায় অন্যত্র) বিয়ে করা পর্যন্ত তুমিই তার বেশি হকদার।' আবু দাউদ : ২২৭৬, মুসনাদে আহমাদ : ৬৭০৭

উপর্যুক্ত নারী সুন্দরভাবে সেই সকল কারণ উপস্থাপন করেছেন, যেগুলোর কারণে সন্তান প্রতিপালনে তার অধিকার তালাকদাতা স্বামীর চেয়ে বেশি। আল্লাহর রাসূলও ﷺ সেসবের প্রতি খেয়াল করে তাকে সন্তান প্রতিপালনের বেশি হকদার বলে ঘোষণা করেন।

আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) তাঁর নিজস্ব বর্ণনাসূত্রে ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

> 'উমর ﵁ তাঁর ছেলে আসেমের মাতা আনসারি স্ত্রীকে তালাক দিলেন। অতঃপর মুহাসসার নামক স্থানে (মদিনা ও কুবার মাঝামাঝি বাজার) ছেলেসহ প্রাক্তন স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। তখন আসেম দুধছাড়া হয়েছিল এবং হাঁটছিল।'
>
> হজরত উমর ছেলেকে নেওয়ার জন্য হাত ধরলেন। তখন ছেলের মাও তাকে টেনে নিতে উদ্ধত হলো। এমন পরিস্থিতিতে ছেলেটি ব্যথা পেয়ে কেঁদে উঠল। তখন উমর ﵁ বললেন– আমি তোমার চেয়ে বেশি হকদার। এ পরিস্থিতির সমাধানে তারা উভয়ে

খলিফা আবু বকর ﵁-এর কাছে বিচার দিলেন। খলিফা ছেলের ব্যাপারে মায়ের পক্ষে রায় দিলেন। সেইসঙ্গে উমর ﵁-কে বললেন– ছেলে যুবক হয়ে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাউকে বেছে নেওয়া পর্যন্ত তার জন্য মায়ের ঘ্রাণ, বিছানা এবং কোল তোমার চেয়ে উত্তম।' মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ১২৬০১

যেহেতু অন্যত্র বিবাহ করা পর্যন্ত সন্তানের প্রতিপালনের অধিকার তার মায়ের, অতএব তার উচিত হবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মাঝে মাঝে পিতাকে সন্তানের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়া। সন্তানকে পিতার সাথে দেখা করতে বাধা দেওয়া জায়েজ নেই। এমনিভাবে তার মাথায় এমন সব কথা ঢুকিয়ে দেওয়াও জায়েজ নেই, যার ফলে সে পিতা ও পিতার আত্মীয়স্বজনকে অপছন্দ করে; কিছু মা যেমনটি করে থাকে। কারণ, ভবিষ্যতে সন্তান তার পিতা থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না। সে তাদেরই একজন এবং তারা একই রক্তের। আরব কবি বলেছিলেন–

'তোমার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক রাখো,
তোমার ভাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখো।
কারণ, যার ভাই নেই– সে ওই ব্যক্তির মতো,
যে অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধে নেমেছে।
আর জেনে রেখ–
কোনো ব্যক্তির চাচাতো ভাই হলো তার জন্য ডানাস্বরূপ
ঈগল পাখি কি ডানা ছাড়া দাঁড়াতে পারে?'

অনুরূপভাবে সন্তান যখন নির্দিষ্ট বয়সের পর পিতার নিকট ফিরে আসবে, তখন পিতার কর্তব্য হলো তাকে মায়ের সঙ্গে দেখা করা থেকে বঞ্চিত না করা। কারণ, এ ধরনের বাধা বা বঞ্চিতকরণ একজন মানুষের পক্ষ থেকে অপরের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ।

ইয়াতিম শিশু প্রতিপালনের অধিকার

দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো শিশু যদি বালেগ হওয়ার পূর্বে পিতার মৃত্যুর কারণে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তাকে ইয়াতিম বলা হয়। তখন তার

লালন-পালনের দায়িত্ব মুসলিম সমাজের ওপর বর্তায়। যদি সে দরিদ্র হয়, তবে তার ব্যয়ভার আত্মীয়স্বজন বহন করবে। আর যদি সে যদি ধনী হয়, তবে উত্তম উপায়ে তার সম্পদ বিনিয়োগ করবে।

যদি তার জিম্মাদারি নেওয়ার মতো আত্মীয়স্বজন না থাকে, তবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজকে তার লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে হবে। মুসলিমদের অভিভাবক নবি ﷺ বলেছেন–

> 'আমি প্রত্যেক মুসলিমের সত্তার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী, যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যাবে, তা হবে তার উত্তরাধিকারদের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ বা দরিদ্র ছোটো সন্তান রেখে যায়, তার দায়িত্ব আমার ওপর।' মুসলিম : ১৬১৯

এ কারণেই কুরআন কারিমে গনিমতের মালে ইয়াতিমের হক রাখা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

> 'আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়স্বজনের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য।' সূরা আল-হাশর : ৭

তিনি আরও বলেন–

> 'আর এ কথাও জেনে রেখ যে, কোনো বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনিমত হিসেবে পাবে, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর ও রাসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়স্বজনের জন্য এবং ইয়াতিম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য।' সূরা আনফাল : ৪১

ইসলামে ইয়াতিমের লালন-পালনকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিলের জন্য অন্যতম মহান নেক আমল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন–

> 'আমি ও ইয়াতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকব, এ কথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের প্রতি ইশারা করেন এবং এ দুটির মাঝে (সামান্য) ফাঁকা রাখেন।' বুখারি : ৬০০৫

ইসলাম ইয়াতিমের ব্যাপারে মুসলিম সমাজের কাছে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দাবি করে–

- ইয়াতিমের সম্পদ থাকলে তা সংরক্ষণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

  'তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত ইয়াতিমদের ধন-সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না; তবে উত্তম পন্থায় যেতে পারো।' সূরা আনআম : ১৫২

  যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করে, তাদের ব্যাপারে কঠিন হুমকি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

  'যারা ইয়াতিমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং শীঘ্রই তারা আগুনে প্রবেশ করবে।' সূরা আন-নিসা : ১০

- এটি প্রথমটির চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হলো, ইয়াতিমের ব্যক্তিত্বের প্রতি খেয়াল রাখা; তাকে ধমক না দেওয়া, কঠোর কথা না বলা এবং হেয় না করা। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

  'সুতরাং আপনি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হবেন না।' সূরা আদ-দুহা : ৯

অন্যত্র বলেন–

'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? সে তো সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দেয়।' সূরা মাউন : ১-২

এভাবে ইয়াতিম শিশু কোনো সমস্যা ও মানসিক যন্ত্রণা ছাড়াই শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে পারবে। সে নিজেকে সমাজের অংশীদার মনে করতে শিখবে এবং নিজেকে হীন বা তুচ্ছ ভাবা থেকে বিরত থাকতে পারবে; বরং সে অনুভব করবে, সমাজ তার প্রতি খেয়াল রাখছে, তার হক আদায়ের জিম্মাদারি নিয়েছে এবং তার মর্যাদা সংরক্ষিত রয়েছে। বড়োরা তার সঙ্গে নিজ ছেলের মতো এবং ছোটোরা আপন ভাইয়ের মতো আচরণ করছে।

পিতা না থাকলে (ইয়াতিম অবস্থায়) মায়ের দায়িত্ব বেড়ে যায়। কারণ, এমতাবস্থায় মা একাই সন্তানের দায়িত্বের বোঝা বহন করেন। সে জন্য অনেক মা তখন বলে থাকেন, আমি এখন বাবা-মা দুটোই। আবার অনেকে যুবতী হওয়া সত্ত্বেও সন্তান প্রতিপালনের জন্য পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, সন্তানের ব্যাপারে তিনি পরবর্তী স্বামীর অবহেলার ভয় করেন।

সাধারণত পুরুষ স্ত্রীর অন্য ঘরের সন্তানকে ভালো চোখে দেখে না। তাদের খুব কমই যত্ন করে থাকে। এমনকী কেউ কেউ বিয়ের সময় সন্তানকে ছেড়ে আসার শর্তও জুড়ে দেয়।

অতএব এ ধরনের মা, যিনি তার সন্তানকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের জীবন ও যৌবন উৎসর্গ করে দেন, তিনি অবশ্যই জান্নাতে রাসূল ﷺ-এর পাশে থাকা 'ইয়াতিমের প্রতিপালনকারী' হিসেবে গণ্য হবেন। যার ব্যাপারে হাদিসে এসেছে–

> 'আমি প্রথম জান্নাতের দরজা খুলব, কিন্তু এক নারীকে দেখব সেও আমার সাথে দরজা খুলতে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন তাকে বলব, তোমার কী হয়েছে? তুমি কে? সে বলবে– আমি এমন একজন নারী, যে ইয়াতিমদের প্রতিপালনে বসে ছিলাম।' আততারগিব ওয়াত তারহিব

কখনো কখনো শিশু মাতৃহারা হয়ে পড়ে। বঞ্চিত হয় স্নেহ ও মমতার ফল্গুধারা হতে। তখন তার আমানতের ভার এসে পড়ে পিতার কাঁধের ওপর। ফলে তার ব্যাপারে পিতার দায়িত্ব দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাকে একই সাথে পালন করতে হয় বাবা ও মায়ের ভূমিকা; যদিও মায়ের কোনো বিকল্প হতে পারে না।

এ ক্ষেত্রেও কোনো কোনো পিতাকে দেখা যায়, স্ত্রীর মৃত্যুর পরও সন্তানের কথা চিন্তা করে নিজের যৌবন থাকা স্বত্ত্বেও, পুনরায় বিবাহ করতে অস্বীকার করে। তারা সন্তানের জন্য সৎমা আনতে রাজি হয় না। কারণ, হতে পারে সেই সৎমা আল্লাহর হুকুম ও আখিরাতের কথা চিন্তা না করে সন্তানের সাথে এমন আচরণ করবে, যা তাদের জীবনে অশান্তি বয়ে আনবে। যেমনটি আমরা বর্তমান সমাজে কোনো কোনো সৎমায়ের ক্ষেত্রে দেখে থাকি।

এ ধরনের ত্যাগী পিতা, যিনি নিজ স্বার্থের ওপর সন্তানকে প্রাধান্য দেন, তার জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান রয়েছে। সাথে মানুষের নিকট সম্মান তো রয়েছে-ই। তার এ কাজ আল্লাহর পথে জিহাদের একটি প্রকার হিসেবে পরিগণিত হবে।

পিতৃত্বের দাবি ত্যাগ

এমন অনেক পিতা রয়েছে, যারা জীবিত অবস্থায় স্বেচ্ছায় পিতৃত্বের দাবি ত্যাগ করে। পিতৃত্ব পরিত্যাগ করা জায়েজ নেই। কারণ, পিতার ওপর সন্তানদের অধিকার রয়েছে। পিতা কেন তার পিতৃত্ব ত্যাগ করবে? হতে পারে তিনি নিজের প্রবৃত্তি ও লালসা নিয়ে ব্যস্ত অথবা ধন-সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয়ে মত্ত। সন্তানকে মায়ের কাছে ছেড়ে দিয়ে সম্পদের দুনিয়ায় অঙ্ক কষতে মগ্ন। আর ওদিকে মা একই সঙ্গে বাবা-মা দুজনের দায়িত্ব পালনে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের পিতা যেন জীবিত থেকেও মৃত, উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত; বরং এ ধরনের পিতা জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুই সন্তানের জন্য অধিক কল্যাণকর। কারণ, মানুষ পিতৃহারা ইয়াতিমের প্রতি অনুগ্রহ করে, কিন্তু পিতার অবহেলিত সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ করে না।

এমন দুর্ভাগা পিতা হয়তো লাখ লাখ কিংবা মিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ সঞ্চয় করতে পারে, কিন্তু এ সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলে নিজের আদরের সন্তানকে, যা স্পষ্টভাবে বড়ো ধরনের ক্ষতি। কারণ, সেই পিতা উত্তম জিনিসের বিনিময়ে ঠুনকো জিনিস গ্রহণ করছে।

এমন পিতাগণ নিজ সন্তানের ওপর জুলুম করছে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তার ওপরও জুলুম করেছে। অনেক সময় নারী চাকরিজীবী হয়। দিনের অধিকাংশ সময় তাকে কর্মক্ষেত্রে থাকতে হয়। অতঃপর ক্লান্ত শরীরে বাসায় ফিরে আবার ঘর সামলাতে হয়, সন্তানের যত্ন নিতে হয়। সন্তানের খাবার-দাবার, পোশাকাদি, পরিচ্ছন্নতা, চিকিৎসা ও শিক্ষাসহ সবকিছুর খেয়াল রাখতে হয়। স্কুলে যাওয়ার জন্য সন্তানকে ভোরবেলায় ঘুম থেকে ডেকে তুলতে হয়। তাদের জন্য খাবার তৈরি করতে হয়। পড়ার কক্ষ, ঘুমের কক্ষ ইত্যাদি প্রস্তুত করতে হয়।

ফলে সে নারী একাধারে মা, বাবা, চাকরানী, বাবুর্চি, সন্তান পালনকারিনী ও শিক্ষিকা! অথচ এসব দায়িত্বের ব্যাপারে বাবা একেবারেই উদাসীন!

এটি স্পষ্ট জুলুম, যা অনেক পুরুষই করে থাকে। এটি স্ত্রীর ওপর জুলুম, সন্তানের ওপরও জুলুম। অথচ আল্লাহ তায়ালা জালিমদের পছন্দ করেন না।

পিতা-মাতার স্নেহবঞ্চিত সন্তান

উপর্যুক্ত অবস্থার চেয়ে আরও মারাত্মক অবস্থা হলো– পিতা-মাতা উভয়ে ব্যস্ততার কারণে আপন সন্তানের ব্যাপারে উদাসীন থাকা, তার কল্যাণের চিন্তা না করা, তাকে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা না দেওয়া এবং কোনটা প্রয়োজন আর কোনটা অপ্রয়োজন তা না শেখানো।

তারা দুজনেই ব্যস্ত, বাবা ব্যস্ত ব্যাবসা বা সম্পদ অর্জনের কাজে। মা ব্যস্ত নিজের রূপচর্চা : গালের রং, ঠোটের রং ও চুলের রঙে বৈচিত্র্য আনয়নে কিংবা টেলিফোন, বান্ধবী, পার্টি ইত্যাদি নিয়ে।

ফলে সন্তান হয়ে উঠে বাবা-মাহারা। অথচ পিতা-মাতা উভয়ে জীবিত; তারা জমিনে দিব্যি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে! এমনকী তারা সব কাজেই ভুমিকা রাখছে; কেবল পিতৃত্ব আর মাতৃত্বেই গাফলতি।

এমন সন্তানই প্রকৃত ইয়াতিম। যার ব্যাপারে কবিসম্রাট আহমদ শাওকি বলেছিলেন–

> 'সে ইয়াতিম নয়– যার পিতা-মাতা তাকে অসহায় রেখে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। অতঃপর সে দুনিয়াতে তাদের বিকল্প পেয়ে সুন্দর শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছে; বরং প্রকৃত ইয়াতিম তো সে-ই, যার মা তাকে ত্যাগ করেছে এবং বাবা ব্যস্ত রয়েছে।'

সন্তানের উত্তম প্রতিপালনে পারস্পরিক দায়িত্ব

সন্তান প্রতিপালনে বাবা-মায়ের সম্পূরক দায়িত্ব হলো–

- দুজনের পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সন্তানকে উত্তমভাবে লালন-পালন করা।

- আত্মিকভাবে তার মনে ঈমান ও ইবাদতের বীজ বপন করা।
- মানসিকভাবে তার মাঝে উত্তম জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।
- চারিত্রিকভাবে উত্তম শিষ্টাচার ও আখলাক শিক্ষা দেওয়া।
- সামাজিকভাবে কল্যাণকর কাজ ও জনসেবার মানসিকতা গড়ে তোলা।
- রাজনৈতিক দিক থেকে স্বজাতি ও নিজ ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত হতে শেখানো।
- শিল্প-সংস্কৃতির জন্য তার মাঝে জগতের পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যের অনুভূতি সৃষ্ট করা।
- ভাষাগত দিক থেকে স্বজাতির ভাষার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করা, যেন সে ভাষা ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং মনের অনুভূতি উত্তমভাবে প্রকাশ করতে পারে।

সন্তানের এ ধরনের প্রতিপালন কঠিন দায়িত্ব। এ ব্যাপারে পিতা-মাতা দুজনই জিজ্ঞাসিত হবেন। যেমনিভাবে মহানবি ﷺ বলেছেন–

> 'তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন দায়িত্বশীল আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম; যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল, সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘরে পরিবার, সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' বুখারি : ৮৯৩

এ দায়বদ্ধতা আল্লাহর কাছে, বিবেকের কাছে এবং সমাজের কাছে।

সন্তানের শৈশবে মায়ের দায়িত্ব বাবার চেয়ে বেশি। কারণ, তিনি সন্তানের কাছে বাবার চেয়ে বেশি সময় কাটান এবং সরাসরি দেখাশোনা করেন। এ জন্যই জ্ঞানী-গুণী, বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক ও কবিগণ মায়ের দায়িত্বের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মাতৃক্রোড়কে সর্বপ্রথম বিদ্যাপীঠ হিসেবে অভিহিত করেছেন। নীলনদের কবি হাফেজ ইবরাহিম তাই বলেছেন–

> 'মা এমন এক বিদ্যাপীঠ, যাকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করার মানে হলো উত্তম চরিত্রের একটি জাতি প্রস্তুত করা।'

সন্তান যত বড়ো হতে থাকে, পিতার দায়িত্বও তত বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে বাবার দায়িত্ব মায়ের চেয়ে বেশি হতে থাকে। কারণ, তখন সন্তানের জন্য দিক-নির্দেশনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজন পড়ে তার আচার-আচরণের প্রতি নিবিড় পর্যবেক্ষণের। এসব দায়িত্ব প্রধানত পিতার ওপরই বর্তায়।

কোনো কোনো পিতা মনে করেন, তার দায়িত্ব কেবল সন্তান জন্ম দেওয়া পর্যন্ত। অতঃপর সন্তানের কথা ভুলে যায়, কিছুই জানে না। এমনও অনেক পিতা রয়েছে, যারা জানেই না তার সন্তান কোন বিদ্যালয়ে পড়ে? কোন ক্লাসে পড়ে? সে পাশ করেছে, নাকি ফেল করেছে? সে বন্ধু-বান্ধব ছাড়া অন্তর্মুখী জীবনযাপন করছে, নাকি বন্ধু-বান্ধবে মত্ত? তার বন্ধুগণ খারাপ নাকি ভালো, অসুস্থ নাকি বিপথগামী?

এ ধরনের পিতাকে সন্তানের বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশে ডাকা হলে কখনো উপস্থিত হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সন্তানের আচার-আচরণের ব্যাপারে পত্র পাঠানো হলেও তার উত্তর প্রদান করে না। এমনকী পড়েও দেখে না। সন্তান কী সঠিক পথে চলল নাকি বিগড়ে গেল। পড়াশোনা করছে নাকি অবহেলা করছে– এসব ব্যাপারেও তার কোনো মাথাব্যথা নেই।

কোনো কোনো পিতা মনে করে, তার দায়িত্ব কেবল সন্তানের বস্তুগত চাহিদা মেটানোর মাঝেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তার জন্য ভালো খাবার, উত্তম পোশাক, সুন্দর বাড়ি ও গাড়ির ব্যবস্থা করা এবং এসবের বিলাসবহুল আয়োজন করাই কেবল পিতার দায়িত্ব! সন্তান যত অর্থ চায়, তা-ই দিয়ে দেয়। কোনো দাবি-ই অপূর্ণ রাখে না। ছোটো-বড়ো সব আবদারই পূরণ করে। অথচ এসবের মাধ্যমে তাকে মূলত অন্যায়ের প্রতি-ই উৎসাহিত করা হয়। যেমনিভাবে কবি আবুল আতাহিয়া বলেন– 'যৌবন, অবসর ও সম্পদের সুলভ্যতা একজন মানুষের নষ্ট হওয়ার জন্য অনেক বড়ো কারণ।'

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ ধরনের পিতা সন্তানের সব মনোবাসনা পূরণ করে মনে করে– সন্তানের প্রতি সকল কর্তব্য পালন করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা স্বামী ও বাবাদের লক্ষ করে বলেন–

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।' সূরা তাহরিম : ৬

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ যাদের ব্যাপারে মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন, সন্তান-সন্ততি তার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা পিতাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা নিজেদের এবং পরিবারকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করে। তারা যেন কেবল খাওয়া, পরিধান এবং অন্যান্য বস্তুগত চাহিদা পূরণ করাকেই যথেষ্ট মনে না করে।

এ জন্য এ আয়াতের তাফসিরে হজরত আলি ﵁ বলেন–

'তাদের কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দান করো।' জাদুল মাসির

রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

'সন্তানের জন্য পিতার পক্ষ হতে সুন্দর শিষ্টাচারের চেয়ে উত্তম দান আর কিছু হতে পারে না।' তিরমিজি ও হাকিম

যে পিতা তার সন্তানদের ভালোবাসে, স্নেহ করে, তার কর্তব্য হলো তাদের জাহান্নাম হতে রক্ষা করা। জাহান্নাম হতে রক্ষা করার অর্থ হলো– তাদের জাহান্নামে যেতে বাধা দেওয়া। বাধা দেওয়ার পদ্ধতি হলো– নাফরমানি, বড়ো গুনাহ, নিষিদ্ধ কাজ এবং ফরজ তরক করা হতে রক্ষা করা। অনুরূপভাবে তাদের ছোটোবেলা থেকে আল্লাহ তায়ালা, পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, পূর্ণ সমাজ ও নিজের প্রতি দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা।

এই শিক্ষা তাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে এবং জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'তারপর যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে সফল হবে।' সূরা আলে ইমরান : ১৮৫

সন্তান প্রতিপালনে একক পদ্ধতি

সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার একক পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যাপারে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, এমন যেন না হয়– পিতা সন্তানের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করবে, আর মাতা শুধু আদর-সোহাগের নীতি অবলম্বন করবে; বরং তাদের উভয়ের উচিত মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। অতিরিক্ত কঠোরতা নয়, আবার বাড়াবাড়ি রকমের আদর সোহাগও করা যাবে না। কারণ, মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা সন্তানের ব্যক্তিত্বের ওপর আঘাত হানে, অপমানিত করে। এতে লাঞ্ছনা অনুভব হয় এবং নিজেকে অবহেলিত ভাবে। এর কারণে তার মাঝে বিভিন্ন মানসিক রোগ দেখা দেয়। ফলে অনেক সময় সন্তান অস্বাভাবিকতা নিয়ে গড়ে ওঠে। আবার কখনো তার মাঝে সমাজের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় এবং তার মধ্যে অন্যায় ও অপরাধের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়।

ইসলাম আমাদের সকল মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ এবং কঠোরতার পরিবর্তে কোমল আচরণ করতে নির্দেশ দেয়। কারণ, যেকোনো বিষয়ে কোমলতা থাকলে তা সুন্দরই হয়। আর কঠোরতা থাকলে তা আর সুন্দর থাকে না। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুতে কোমলতা পছন্দ করেন; এমনকী বিরোধীপক্ষ ও শত্রুদের সাথেও। অতএব, মুমিনগণ যে সন্তানকে চোখের প্রশান্তি বানানোর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, তার ব্যাপারে কতটুকু কোমলতা করা উচিত– তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। কুরআনে এসেছে–

> 'যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করো।' সূরা ফুরকান : ৭৪
>
> একবার এক বেদুইন নেতা দেখলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর নাতিকে আদর করে চুমু দিচ্ছেন। এতে বেদুইন নেতা বিস্ময় প্রকাশ করলে রাসূল ﷺ তা অপছন্দ করেন। তখন অপর একজন সাহাবি নবি ﷺ-কে বললেন– 'আমার দশটি সন্তান আছে, কিন্তু তাদের কাউকে কখনোই চুমু খাইনি!' তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'যে অপরের প্রতি দয়া করে না, সে দয়াপ্রাপ্ত হয় না।' বুখারি : ৫৯৯৭, মুসলিম : ২৩১৮

'হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর কাছে এক বেদুইন এসে বলল, "আপনারা শিশুদের চুমু দেন, অথচ আমরা তাদের চুমু দিই না!" তখন রাসূল ﷺ বললেন– "আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নিলে আমি কি তোমার জন্য কিছু করতে পারব?"' বুখারি : ৫৯৯৮

শিশুদের অন্যতম অধিকার হলো– তাদের জন্য যথেষ্ট খেলাধুলার সুযোগ করে দেওয়া। যেন সে খেলার আগ্রহ মেটাতে পারে। এটি তার মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক স্বভাব। কারণ, তার মাঝে রয়েছে অনেক শক্তি, খেলাধুলার মাধ্যমে সেই শক্তি কাজে লাগাতে চায়। এর ফলে তার পেশি শক্তিশালী হয়। শরীরচর্চা হয়। কাজে প্রাণচঞ্চলতার সৃষ্টি হয় এবং আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়। সমবয়সি শিশুদের সঙ্গে খেলার সুযোগ করে দিতে হবে। সম্ভব হলে পিতা নিজেও তার সাথে খেলায় অংশগ্রহণ করবে। খেলার ভান করে হলেও শরিক হবে।

কোনো একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেছিলেন–

'সাত বছর বয়সে তোমার ছেলের সঙ্গে খেলাধুলা করো, সেই বয়সে তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দাও এবং তখন তার সাথে ভাইয়ের মতো আচরণ করো, তারপর তার রশি ছেড়ে দাও।'

বর্তমান যুগে বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা বেরিয়েছে, যেগুলোতে বুদ্ধি ব্যবহার করতে হয়। ছোটো সন্তানদের জন্য এসব খেলনার ব্যবস্থা করাও উত্তম।

আধুনিক যুগের আবিষ্কার কমপিউটারে বিভিন্ন ধরনের খেলা রয়েছে, সন্তানের বয়স ও সক্ষমতা অনুযায়ী এমন সব খেলা বাছাই করে দেওয়া, যা ধর্ম ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহর রাসূল ﷺ শিশুদের সঙ্গে খেলতেন। তিনি নাতিদের পিঠে চড়াতেন; এমনকী নামাজ ও সিজদারত অবস্থায়ও। একবার সিজদারত অবস্থায় তাঁর নাতি হাসান বা হোসাইন পিঠে উঠে বসল, তখন সিজদাহ এত দীর্ঘ করলেন যে, সাহাবাগণ কোনো কিছু ঘটার আশঙ্কা করলেন।

অতঃপর তিনি সিজদাহ হতে উঠলেন এবং নামাজ শেষ করলেন। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, সিজদাহ এত দীর্ঘ করার কারণ কী? উত্তরে রাসুল ﷺ বললেন–

> 'আমার নাতি পিঠে উঠে বসেছিল। তাকে দ্রুত নামিয়ে দিতে অপছন্দ করছিলাম।' বুখারি ও মুসনাদে আহমাদ

তিনি নাতিকে জোর করে পিঠ থেকে নামিয়ে দিতে চাননি। তিনি চাননি তার পিঠে চড়ার মজা শেষ হয়ে যাক; বরং তাকে সুযোগ দিয়েছেন, যেন সে পিঠে আরোহণের মজা উপভোগ করে তৃপ্ত হয়। অতঃপর নিজ থেকে নেমে পড়ে!

তিনি আবু তালহার ছেলের সঙ্গে দুষ্টুমি করতেন এবং বলতেন–

> 'হে আবু উমাইর, তোমার নুগাইর (ছোটো পাখি) এর কী খবর?' বুখারি, মুসলিম

একদিকে যেমন সন্তান প্রতিপালনে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা অপ্রয়োজনীয় ও অগ্রহণযোগ্য, তেমনি অতিরিক্ত আদর-সোহাগ করাও অনুচিত।

অতএব, সন্তানকে এ যুক্তিতে নিজের খেয়ালমতো চলতে দেওয়া উচিত নয় যে, সে প্রথম সন্তান বা ছেলে সন্তান অথবা একমাত্র ছেলে বা একমাত্র সন্তান কিংবা সর্বকনিষ্ঠ সন্তান; বরং তার ভুল শুধরিয়ে দেওয়া কর্তব্য। অন্যায় আচরণের জন্য শাসন করা জরুরি। বিশেষ করে যদি একই অন্যায় বারবার করে। তবে তা করতে হবে অত্যন্ত সুন্দর ও কোমলতার সঙ্গে। যেন উলটো জটিলতার সৃষ্টি না হয়। অনেক সময় আমরা ভুলের মাধ্যমে ভুল শোধরানোর চেষ্টা করি। আবার কখনো গুরুতর ভুলের মাধ্যমে সাধারণ ভুল ঠিক করতে যাই!

সন্তান যেন বুঝতে পারে, পিতা-মাতা উভয়েই তার প্রতি ন্যায়বিচার করছে। সে যেন কোনো কিছুতেই পক্ষপাতিত্ব বা জুলুম অনুভব না করে। সালফে সালেহিনগণ প্রত্যেকটা বিষয়ে, এমনকী আদরের ক্ষেত্রেও সন্তানের মাঝে সমতা বজায় রাখতেন। কারণ, সন্তান যদি বুঝতে পারে কাকে বেশি ভালোবাসে, তবে তার প্রতি মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়; এমনকী পিতা-মাতার প্রতিও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

কুরআনে ইয়াকুব (আ.)-এর সাথে ইউসুফ (আ.) ও তাঁর ভাই বেনিয়ামিনের ঘটনা এসেছে। অন্য ভাইদের তুলনায় তাদের প্রতি পিতার অধিক ভালোবাসার কথা বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত হয়েছে– উক্ত ভালোবাসা কীভাবে তাদের ভাইদের মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। উক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে এমন অন্যায় ও বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল, যার প্রভাব কয়েক দশক পর্যন্ত ছিল।

এ জন্যই রাসূল ﷺ বলেন–

> 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ন্যায়বিচার করো।'

কোনো একজন সাহাবি সন্তানকে বিশেষ অনুদান প্রদানের জন্য নবি ﷺ-কে সাক্ষী বানাতে চাইলেন। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন–

> 'তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে এমন অনুদান প্রদান করেছ?' জবাবে তিনি বললেন– 'না।' অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন– 'এ ব্যাপারে আমি ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী বানাও। কারণ, আমি জুলুমের ওপর সাক্ষী হব না।'

লেখক পরিচিতি

ইউসুফ আল কারজাভি।
আজকের দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ ও আলিম। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি অতুলনীয়। জাহেলিয়াতের নানা চ্যালেঞ্জের মুখে সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয় নিরসনে প্রাজ্ঞতার সাথে কাজ করছেন।
১৯২৬ সালের মিশরে জন্ম নেওয়া এই মহান ব্যক্তিত্ব 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন'-এর অন্যতম আধ্যাত্মিক নেতা। পড়াশোনা করেছেন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রজীবনেই শিক্ষকদের নিকট হতে 'আল্লামা' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। লিখেছেন শতাধিক গ্রন্থ। আলিমদের আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইত্তেহাদুল আলামি লি উলামাইল মুসলিমিন'-এর সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।
বর্তমানে কাতারে বসবাস করছেন। বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনের অন্যতম অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বিশ্বায়ন ও আধুনিকায়নের নাম দিয়ে আমাদের পরিবারগুলো ভেঙে ফেলার আয়োজন করেছে জাহেলিয়াত। অথচ ইসলামি জীবনব্যস্থার মূল ভিত্তি পরিবার। যেখানে সুদৃঢ় পারিবারিক কাঠামো অনুপস্থিত, সেখানে সুস্থ জীবন গঠন এবং নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অলীক কল্পনা বিলাস!

ইসলাম সর্বাত্মকভাবে একটা সুখী ও প্রশান্তচিত্ত 'পরিবার' নির্মাণে তৎপর। এই গ্রন্থে ইসলামের সেই আকাঙ্ক্ষা ও করণীয় বিবৃত হয়েছে। চলুন, দেখে নিই...